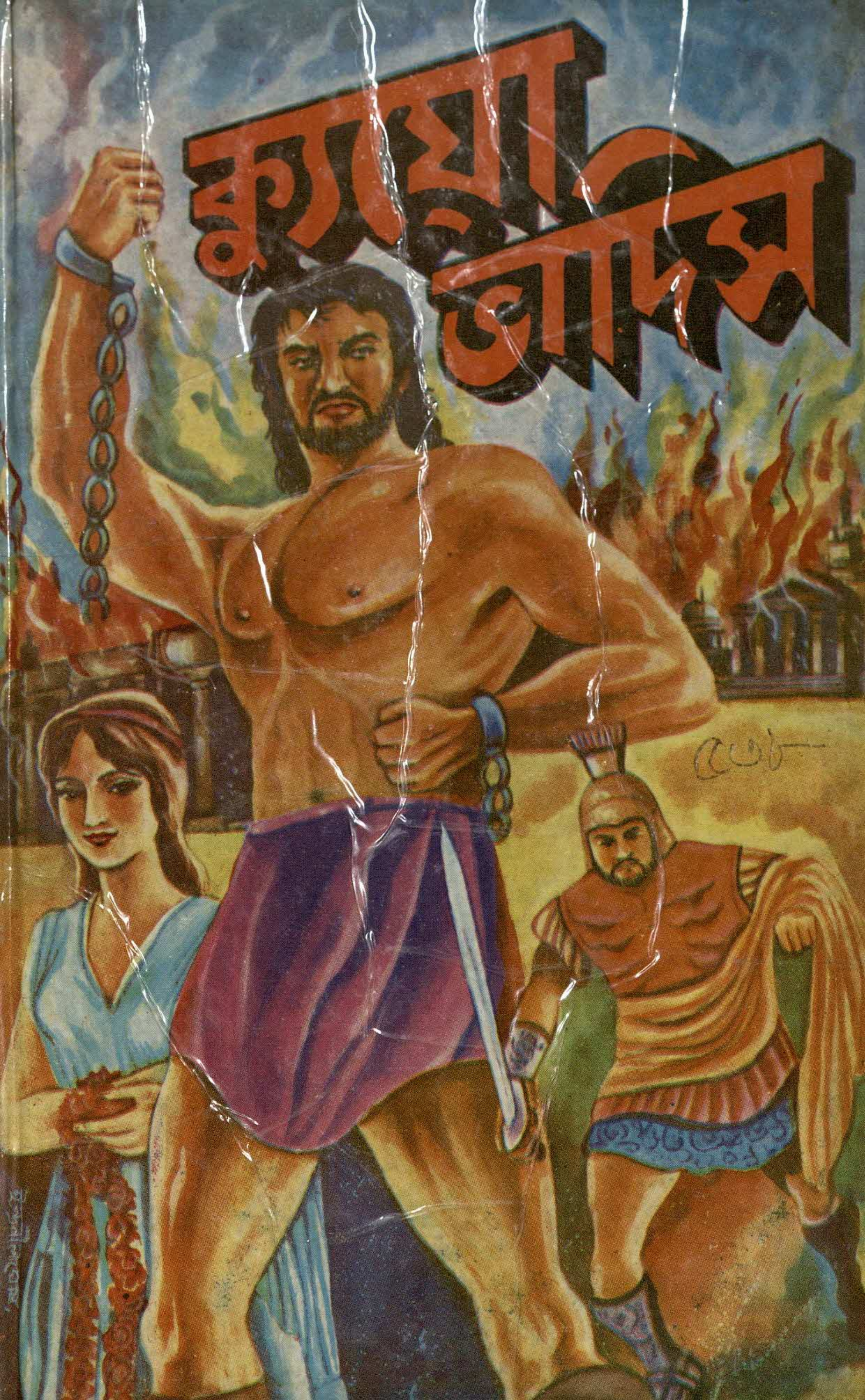

ক্রীতদাস

হেনরিক সিনকুইজ

ক্যুয়ো ভাদিস

রূপান্তর

ডঃ মিলন দত্ত

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭/সি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
নভেম্বর ১৯৮৬

প্রকাশক ঃ
সি, ভট্টাচার্য
ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

মুদ্রক ঃ
নিতাই সামন্ত
পুষ্প প্রিন্টার্স
১৫ অনাথ দেব লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য ঃ ৮·০০ টাকা

॥ ভূমিকা ॥

'কুয়ো ভাদিস' বিশ্ববিখ্যাত একটি গ্রন্থ। রোমান সম্রাট নীরোর শাসনকালে খ্রীষ্টানদের উপর অবর্ণনীয়, অত্যাচারের পটভূমিতে এর মধ্যে রোমান সেনাপতি মার্কাস্ ভিনিসিয়াস ও লিজিয়ান রাজকন্যা লিজিয়ার অপূর্ব প্রেমকাহিনী এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। মার্কাস ভিনিসিয়াস কিরূপে ধীরে ধীরে সত্য ধর্মের মহিমা বুঝতে পারলেন, লেখক অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে তার বিবরণ দিয়েছেন।

ছোটদের জন্যে এই বিশাল ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাংলা রূপান্তর খুবই কঠিন কাজ। কিশোর উপযোগী করতে অনেক ক্ষেত্রে মূল কাহিনীর অংশ বিশেষ বর্জন করতে হয়েছে, গ্রহণ করতে হয়েছে ভিন্ন কাহিনীর কিছু অংশ। আশা করা যায়, এই রূপান্তর ছোটদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হবে।

॥ আমাদের অন্যান্য অনুবাদ ও কমিকস ॥

মবি ডিক	ডঃ মিলন দত্ত
অ্যাডভেঞ্চারস অব টম সয়ার	”
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন	”
ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মি. হাইড	”
অলিভার টুইষ্ট	”
দি লাষ্ট ডেজ অব পম্পেই	শ্যামলী বসু

কমিকস

ডন কুইক্সোট

থ্রী মাস্কেটিয়ারস

মহাভারত/রামায়ণ

॥ সম্রাট নীরো এবং তাঁর পারিষদবৃন্দ ॥

রোম পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য।

জ্ঞানে গরিমায় গৌরবে রোমের তুলনা নেই।

দুর্ধর্ষ রোমান বাহিনী পৃথিবীর বহু দেশ জয় করে বিশাল এক সাম্রাজ্যের পত্তন করেছে।

শুধু যুদ্ধবিদ্যায় নয়, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, বাগ্মিতা, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতিতেও রোমের স্থান সকলের উপরে।

পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের আনাগোনা রোমে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে রোম সবার সেরা।

রোমের সম্রাট ক্লডিয়াস সীজার নীরো।

অদ্ভুত মানুষ এই নীরো।

তিনি নিজেকে ভাবেন বিশ্বের সেরা কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও রথচালক। তাঁর ধারণা, রোমানদের ঈশ্বর তিনি। তাঁর চেয়ে ক্ষমতাবান কেউ নেই। তিনি সকলের প্রভু।

তিনি যখন কবিতা পড়েন, তখন সকলকে চুপ করে সেই কবিতা শুনতে হয়। আর কবিতা পাঠ শেষ হলে কবিতার খুব প্রশংসা করতে হয়। আহা। অপূর্ব। অপূর্ব। এমন কবিতা দেবতা ছাড়া কেউ লিখতে পারেন না।

নীরোর কবিতা পাঠের সময় কোন শ্রোতা যদি একটু অমনোযোগী হন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা পাকা।

নীরো ভয়ানক বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, খেয়ালী ও নিষ্ঠুর। এমন নিষ্ঠুর যে নিজের মাকে হত্যা করতে তাঁর হাত কাঁপেনি। নরহত্যা তাঁর কাছে কোন ব্যাপারই না।

নিজের সামান্য খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে তিনি হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেন না।

নীরো ভালোবাসেন তোষামোদ। যাঁরা তাঁকে খুব তোষামোদ করতে পারেন, নীরোর কাছে তাঁদের খুব খাতির। এইসব চাটুকারের দল নীরোর তোষামোদ করে তাঁকে স্বর্গের দেবতা বানিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যের মধ্যে এদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচণ্ড। নীরোর নাম করে এরা যা খুশি তাই করতে পারেন।

রোমের মানুষ নীরোর ভয়ে সর্বদা কম্পমান। নীরোর অত্যাচার খড়্গের মতো মাথার উপর নেমে আসে। নীরোর রাজ্যে মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই। নীরোর রক্ষীবাহিনী কারো বাড়িতে হাজির হলেই বোঝা যায়, তার জীবনের শেষ প্রহর উপস্থিত।

নীরোর রাজত্বে মেয়েদের বিপদ সবচেয়ে বেশী। নীরোর আদেশবলে যে কোন মেয়েকে যে কোন জায়গায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদের ভাগ্যে কি ঘটে, কেউ জানে না।

নীরোর পারিষদদের মধ্যে আছেন পেত্রোনিয়াস, সেনেকা, তাইজেলিয়াস, লুকাস, বারসাস, ভ্যাটিনিয়াস, ভিটেনিয়াস প্রভৃতি। এইসব পারিষদ সব সময় দলাদলিতে মেতে থাকেন। কে সম্রাটকে খুশি করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করবেন, তাই নিয়ে সর্বক্ষণ চলছে প্রতিযোগিতা।

এদের মধ্যে পেত্রোনিয়াস একটু ভিন্ন জাতের। তিনি অসাধারণ শক্তিমান ও রূপবান। তাঁর সুগঠিত সুন্দর শরীর যেন গ্রীক ভাস্কর্যের প্রতীক। তিনি কাব্যরসিক। নিজেও ভালো কাব্য রচনা করেন।

ভোগ বিলাসের মধ্যে তিনি জীবন কাটাতে ভালোবাসেন। তিনি নীরোকে তোষামোদ করেন না, বুদ্ধি কৌশলে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে রাখেন।

পেত্রোনিয়াসের প্রধান প্রতিপক্ষ তাইজেলিয়াস। নীরোর অনুগ্রহে তাইজেলিয়াস প্রচণ্ড রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী।

॥ মার্কাস ভিনিসিয়াসের কথা ॥

পেত্রোনিয়াস বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সুরসিক ও সুদর্শন। নীরো তাঁকে বেশ পছন্দ করেন।

কাল রাতে নীরোর প্রাসাদে ভোজের নেমন্তন্ন ছিল। ভোজের পর নীরো আবার একটা আলোচনা শুরু করলেন। বিষয়টা ছিল: মেয়েদের আত্মা আছে কি নেই।

ভোজ খেয়ে আলোচনা সেরে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল পেত্রোনিয়াসের। তাই আজ ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরী হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে পেত্রোনিয়াস বাথরুমে ঢুকলেন।

পেত্রোনিয়াসের বাথরুমটা বিশাল। চারধারে বড় বড় আয়না। কারুকার্য করা মেঝে। ঠাণ্ডা জল গরম জলের ব্যবস্থা। বিশাল বাথটবে গোলাপ জল ভরা।

বাথরুমে থাকতে থাকতে খবর এল মার্কাস ভিনিসিয়াস এসেছেন। ভিনিসিয়াস পেত্রোনিয়াসের ভাগনে।

কিন্তু সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়।

ভিনিসিয়াস মস্ত বড় বীর। তিনি সম্প্রতি পার্থিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেছেন। তিনি দেখতেও খুব সুন্দর।

পার্থিয়ানরাও বীরজাতি। তাদের যুদ্ধে পরাজিত করা খুব সোজা নয়। ভিনিসিয়াস তাদের পরাজিত করে রোমের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পেত্রোনিয়াস ভাগনেকে আদর করে বসালেন। তারপর তার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন।

মামা ভাগনের মধ্যে অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। দুজনের মধ্যে খোলাখুলি অনেক কথাবার্তা হয়।

ভিনিসিয়াস বললেন, দ্যাখ মামা, তোমাকে একটা কথা বলি। যুদ্ধ জয় করে রোমে ফিরে আসার পর সম্রাটের আদেশে আমাকে

নগরের বাইরের দিকে প্রাক্তন সেনাপতি এ্যালাম প্লতিয়াসের বাড়িতে দিন পনেরো থাকতে হয়েছিল।

পেত্রোনিয়াস বললেন, সে খবর তো আমার জানা আছে। তা প্লতিয়াসের বাড়িতে বাস করবার সময় কোন ঘটনা ঘটেছে ?

—ঘটেছে। ভিনিসিয়াস বললেন, আমি সে বাড়িতে দশদিন বাস করেও জানতে পারিনি যে সেখানে একজন দেবী আছে।

—দেবী ? পেত্রোনিয়াস অবাক হয়ে বললেন, দেবী আবার কে ?

—সেই কথাই তো বলছি। প্লতিয়াসের বাড়িটা তো তুমি দেখেছো। বিশাল বাড়ি। ফুলের বাগান, ফোয়ারা, নানা ধরনের ষ্ট্যাচু। একদিন খুব ভোরবেলা আমি বাগানে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ দেখি বাগানের মধ্যে ফোয়ারার জলের ধারায় এক অপূর্ব সুন্দরী দেবী স্নান করছে। আমি ভাবলাম, বোধহয় সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস—ভেজা শরীর থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে।

—বল কি। তুমি প্লতিয়াসের প্রাসাদে ভেনাসকে দেখে ফেললে ?

—ভেনাসকেই দেখেছি, তবে ভেনাসের মতো অলৌকিক দেবী নয়, এ সত্যই মানবী। পরে আরো একবার দেখেছি তাকে। আর তারপর থেকে রাতদিন আমি শুধু তার কথাই ভাবছি।

—মেয়েটির নাম জেনেছো ?

—জেনেছি। বাড়ির লোক তাকে লিজিয়া বলে ডাকে। তার আসল নাম কলিনা। লিজিয়া দেশের মেয়ে বলে তাকে লিজিয়া নামে ডাকা হয়।

পেত্রোনিয়াস বললেন, প্লতিয়াসের নিজের কোন মেয়ে নেই। আমার তো মনে হয় ও কোন ক্রীতদাসী হবে।

—না ও কোন ক্রীতদাসী নয়।

—তবে।

—শুনেছি লিজিয়া লিজিয়া দেশের রাজার মেয়ে। রাজা ক্লাডিয়াসের রাজত্বকালে লিজিয়ানদের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ হয়। লিজিয়ানরা

যুদ্ধে হেরে গেলে তাদের রাজার মেয়েকে জামিনস্বরূপ রোমে নিয়ে আসা হয় যাতে তারা আর যুদ্ধ করতে না পারে।

পেত্রোনিয়াস অবাক হয়ে বললেন, তুমি এত কথা জানলে কি করে?

ভিনিসিয়াস হেসে বললেন, প্লতিয়াস নিজে আমাকে এসব ঘটনা জানিয়েছেন। প্লতিয়াসের স্ত্রী পম্পেনিয়া লিজিয়াকে নিজের মেয়ের মতো বড় করে তুলেছেন। তার শিক্ষাদীক্ষায় লিজিয়া আজ রোমের একজন সেরা মেয়ে। রূপে গুণে তার তুলনা কোথায়?

পেত্রোনিয়াস বললেন, তা তুমি এখন কি চাও?

—লিজিয়াকে না পেলে আমি বাঁচবো না। তুমি একটা ব্যবস্থা করো।

পেত্রোনিয়াসের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমার ব্যাপার যখন, তখন আমাকে চেষ্টা করতে হবে বৈকি। প্লতিয়াস যদিও আমার এই বিলাসী জীবনযাত্রা পছন্দ করেন না, তথাপি আমাকে খুব একটা অপছন্দ করেন না। তিনি জানেন আমি ডোমেটিয়াস, টাইজেলিয়াস বা নীরোর অন্যান্য পারিষদদের মতো বদমাস নই। যাহোক চল আগে খেয়ে নেওয়া যাক। খাবার পর যাবো প্লতিয়াসের প্রাসাদে।

পেত্রোনিয়াস ভিনিসিয়াসকে নিয়ে খাবার ঘরে ঢুকলেন। এ ঘরটিও খুব সাজানো। খাবার টেবিলে থরে থরে সাজানো নানা রকম খাদ্যদ্রব্য। দুজন গ্রীক সুন্দরী তরুণী আর দুজন নিগ্রো তরুণী খাদ্যদ্রব্য এগিয়ে দিতে লাগল। খাবার পর ওরা সুন্দর করে সাজানো এক রথে উঠলেন। যাবেন প্লতিয়াসের প্রাসাদে। পেত্রোনিয়াস বললেন, লিজিয়ার সঙ্গে তোমার কোন কথাবার্তা হয়েছিল?

ভিনিসিয়াস বললেন, আমি চলে আসবার আগের দিন লিজিয়াকে একদিন বাগানের মধ্যে দেখতে পেলাম। সে তখন গাছের গোড়ায়

জল ঢালছিল। আমি তাকে বললাম যে এখানকার স্মৃতি আমার কাছে মধুর হয়ে থাকবে।

পেত্রোনিয়াস বললেন, লিজিয়া কি বলল ?

ভিনিসিয়াস বললেন, সেই তো অবাক কাণ্ড। লিজিয়া কিছুই বলল না, শুধু একটা ডাল দিয়ে মাটির উপর ছবি আঁকল।

—ছবি ? কিসের ছবি ?

—মাছের।

—মাছের ? পেত্রোনিয়াস অবাক হয়ে বললেন।

—হ্যাঁ মাছের। ভিনিসিয়াস বললেন, মাছের ছবি আঁকল কেন, তার মানে কিছু বুঝতে পারলাম না।

—মাছের ছবির বিষয় প্লিনি তোমার কাছে বুঝিয়ে বলতে পারবেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো।

রথটি তখন ধীরগতিতে ছুটে চলছিল জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়ে। জুলিয়াস সীজারের মর্মর মূর্তির নীচে অসংখ্য নরনারী বেড়াচ্ছিল। ক্যাষ্টর ও পোলাক্সের মন্দিরের সিঁড়িতে অনেক মানুষের ভিড়। জুপিটারের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে।

ভিনিসিয়াস অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন জনতার পানে।

তিনি অনেকদিন রোমছাড়া।

রাজপথে ঘুরছে কত দেশের মানুষ। ইথিওপিয়ান, ব্রিটন, গল, জার্মান, আরব, সিরিয়ান, ইহুদী, মিশরীয়, যাযাবর প্রভৃতি কত জাতি। রথ এসে থামল একটা বড় বইয়ের দোকানের সামনে।

পেত্রোনিয়াস দোকানে ঢুকে একটা সুন্দর বই এনে ভাগনের হাতে দিয়ে বললেন, এটি তোমাকে দিলাম।

ভিনিসিয়াস মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, বা! বেশ সুন্দর বই তো।

কার লেখা ? বইটার নাম দেখছি—'দি স্যাটরিকন'।

—আমার। কিন্তু কেউ তা জানে না। তুমিও কাউকে বলো না।

ভিনিসিয়াস প্রশংসার চোখে মামার দিকে তাকান। তাঁর মামা

দেখতে যেমন সুন্দর, গুণও তার অঢেল। রোমে অবশ্য অসংখ্য গুণী মানুষ আছেন। আছেন জগৎ বিখ্যাত মনীষী। তবু তাঁর মামাও কারও চেয়ে কম যান না।

॥ লিজিয়ার কথা ॥

রথ এসে থামল প্লতিয়াসের বিশাল প্রাসাদের সামনে। ভারি সুন্দর প্রাসাদ। প্রাসাদের সর্বত্র রোমান স্থাপত্যের নিদর্শন।

সদর দ্বারে দাঁড়িয়েছিল একজন তরুণ সুদর্শন ক্রীতদাস। সে তাদের ভিতর দিকে নিয়ে গেল।

ভিনিসিয়াস মৃদুস্বরে বললেন, মামা, তুমি লক্ষ্য করেছো, এখানকার ক্রীতদাস শেকলে বাঁধা থাকে না!

পেত্রোনিয়াস বললেন, এখানকার সব ব্যাপারই অদ্ভুত। প্লতিয়াসের স্ত্রী পম্পেনিয়া সম্পর্কে শোনা যায় সে একজন খ্রীষ্টের ভক্ত।

বাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে পেত্রোনিয়াস মুগ্ধ চোখে চারদিকে দেখছিলেন। বাগানের মধ্যে ফুটে আছে অজস্র লিলি আর আইরিস। লোকজনের কোন কোলাহল নেই। সব জায়গায় এক অখণ্ড শান্তির পরিবেশ।

বাগান পেরিয়ে অন্দরমহলের সামনে আসতে একটি ক্রীতদাস সুদৃশ্য পর্দা একপাশে টেনে ধরল। বিনম্র ভঙ্গীতে এগিয়ে এলেন প্লতিয়াস।

প্লতিয়াস সৌম্যদর্শন বয়স্ক মানুষ। রোমান সেনাপতি হিসাবে অনেক যুদ্ধজয়ের নায়ক। এখন তিনি তাঁর নিভৃত প্রাসাদে অবসর যাপন করেন।

পেত্রোনিয়াস হেসে বললেন, আমার ভাগনে আপনার আশ্রয়ে থাকার সময় যে সুন্দর ব্যবহার করেছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে এলাম। আমরা আপনার কাছে ঋণী।

প্লতিয়াস বললেন, আপনি এসেছেন। আমার বড় সৌভাগ্য। আমিও তো আপনার কাছে ঋণী।

—কিভাবে ? পেত্রোনিয়াস অবাক হলেন।

—আপনি আমার প্রিয় বন্ধু ভেসপ্যাসিয়ানের জীবন রক্ষা করেছিলেন।

পেত্রোনিয়াস ঘটনাটা ভালো করে মনে করতে পারলেন না। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, বুঝতে পারছি না তো।

প্লতিয়াস ওদের সমাদর করে বসিয়ে বললেন, ভেসপ্যাসিয়ানের অপরাধ, সে সম্রাট নীরোর কবিতা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এবার পেত্রোনিয়াসের মনে পড়ল ঘটনাটা।

তিনি বললেন, হাঁা, সেই অপরাধে নীরো তার শরীরের শিরাগুলি কেটে ফেলবার আদেশ দিয়েছিলেন।

প্লতিয়াস বললেন, আপনি তখন নীরোকে বলেছিলেন যে অর্ফিয়াসের গান শুনে বনের পশুরা ঘুমিয়ে পড়ত, আর আপনার কবিতা শুনে মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে, এ তো একটা বিরাট ব্যাপার। এর থেকেই তো বোঝা যায়, মহামান্য সম্রাট কি অসাধারণ কবিতা রচনা করেন। আর এই কথা শুনে নীরো ভেসপ্যাসিয়ানের প্রাণ নেবার বদলে তাকে অনেক পুরস্কার দিলেন।

—যত সব মূর্খের দল।

পেত্রোনিয়াস হো হো করে হেসে উঠলেন।

তার হাসি থামতেই বসবার ঘরের ও পাশের বাগান থেকে ভেসে এল মিষ্টি গলার খিলখিল হাসি।

পেত্রোনিয়াস জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে প্লতিয়াস বললেন, ও হচ্ছে আমার ছেলের হাসি। বাগানে লিজিয়ার সঙ্গে বল নিয়ে খেলছে। চলুন না, আমার ভিতরের বাগানটা একটু দেখে আসবেন।

—নিশ্চয়। নিশ্চয়।'

পেত্রোনিয়াস এই চাইছিলেন। চোখের ইসারায় ভাগনেকে উঠতে বললেন।

ওঁরা তিনজনে বাগানের দিকে এগোতে লাগলেন।

দূর থেকে দেখা গেল একটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে লিজিয়ার সঙ্গে খেলছে।

লিজিয়াকে দেখে পেত্রোনিয়াস অবাক। এত সুন্দরী মেয়ে। ঠিক যেন আলোর প্রতিমা। বাচ্চা ছেলের সঙ্গে বল নিয়ে ছুটোছুটি করার জন্যে সামান্য হাঁপাচ্ছে। ওদের আসতে দেখে লিজিয়া হাতে বল নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাচ্চা ছেলেটি ছুটে এল ভিনিসিয়াসের দিকে। ভিনিসিয়াস লিজিয়ার সামনে এসে মাথা নত করে তাকে সম্মান দেখাল।

একটু দূরে বসেছিলেন পম্পেনিয়া।

ওরা তার কাছে গিয়ে নমস্কার জানালেন।

পম্পেনিয়া তাদের আপ্যায়ন করে বসালেন।

এদিকে বাচ্চা ছেলেটি এসে ভিনিসিয়াসকে টানাটানি করতে লাগল, চল না আমার সাথে বল খেলবে। ভিনিসিয়াস যখন আগে এ বাড়িতে ছিলেন, তখন বাচ্চাটার সাথে প্রায়ই বল খেলতেন।

ভিনিসিয়াস হেসে বললেন, চল আজ তোমার সাথে খেলবো। ভিনিসিয়াস উঠে বাচ্চার হাত ধরে বাগানের ওদিকে চলে গেলেন। পেত্রোনিয়াস প্লতিয়াস আর পম্পেনিয়ার সাথে কথা বলতে লাগলেন। ভিনিসিয়াস বাচ্চার সঙ্গে বল নিয়ে খেলতে লাগলেন। একটু দূরে লিজিয়া ছবির মতো দাঁড়িয়ে।

বাচ্চার খেয়াল। কিছুক্ষণ খেলার পর ছুটে গেল মাছের চৌবাচ্চার দিকে। মাছের চৌবাচ্চার মধ্যে লাল নীল খয়েরী রূপালী কত রঙের মাছ খেলা করছে। চৌবাচ্চার উপর ফোয়ারার জল পড়ছে। বাচ্চাটি মাছের চৌবাচ্চার সামনে বসে হাত দিয়ে মাছ ধরতে লাগল।

ভিনিসিয়াস ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন লিজিয়ার দিকে।



সবুজ গাছপালার নীচে লিজিয়াকে মনে হচ্ছিল বনদেবী। বহু যুদ্ধের বীর নায়ক ভিনিসিয়াসের বুক কাঁপছিল লিজিয়ার সামনে যেতে।

লিজিয়ার সামনে গিয়ে কোনমতে মুখস্থ বলার মতো বলে গেলেন, ছাখ, জ্ঞান হবার পর থেকেই আমি সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেছি। আমি এতদিন ভাবতাম, যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন কিছুতে সুখ নেই, কিন্তু এখন আমার মনে হয়, ভালোবাসাতেই সুখ। তোমাকে আমি ভালোবাসি, এতে যে আমি কত সুখী তা বলে বোঝাতে পারবো না।

লিজিয়া অবাক হয়ে শুনতে লাগল ভিনিসিয়াসের কথাগুলো। ওই এলোমেলো কথাগুলো যেন তার কানে স্বর্গের গান বলে মনে হচ্ছিল। তার বুকের মধ্যেও যেন এক ধরনের আশ্চর্য পুলক জাগছিল।

ভিনিসিয়াসের সারা শরীরের উপর অস্তগামী সূর্যের সোনালী আভা। লিজিয়ার মনে হচ্ছিল, তার সামনে যেন এক স্বর্গের দেবতা দাঁড়িয়ে।

ভিনিসিয়াস আকুল কণ্ঠে বললেন, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো লিজিয়া ?

লিজিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলল, না তো।

এই সময় সেখানে হাজির হলেন প্লতিয়াস।

তিনি ভিনিসিয়াসকে বললেন, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আর বেশীক্ষণ ঠাণ্ডায় থাকবেন না।

ভিনিসিয়াস একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার ঠাণ্ডা লাগে না।

প্লতিয়াস বললেন, যুবকরা ঠাণ্ডার ভয় করে না। তবুও সাবধান হওয়া উচিত।

ওঁরা সকলে এগিয়ে যেতে লাগলেন ভিতর বাগানের দিকে যেখানে পম্পেনিয়া আর পেত্রোনিয়াস বসে কথা বলছিলেন।

প্লতিয়াসের প্রাসাদের এই শান্ত নির্জন পরিবেশ পেত্রোনিয়াসের খুব ভালো লাগছিল।

অস্তগামী সূর্যের শেষ আভা, বাগানের মনোরম সৌন্দর্য, এখানকার মানুষের শান্ত কমনীয়তা পেত্রোনিয়াসের মনকে যেন আবিষ্ট করে ফেলছিল।

তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি এতদিন ধরে যে সৌন্দর্য ও শান্তির সন্ধান করে ফিরছেন, তা যেন এখানেই আছে। তিনি যে বিলাস ও আড়ম্বর ভরা জগতে বাস করেন, সেই জগৎ থেকে এ জগৎ কত আলাদা।

তিনি পম্পেনিয়ার দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, আপনি যে জগতটায় বাস করেন, সেটা কত আলাদা। মনে হয়, সম্রাট নীরো বোধহয় এ জগতের শাসনকর্তা নন।

পম্পেনিয়ার মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, আমার জগতের শাসনকর্তা নীরো নন, আমার জগতের শাসনকর্তা ঈশ্বর।

পেত্রোনিয়াস অবাক হয়ে বললেন, আপনি তাহলে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

পম্পেনিয়া স্থির বিশ্বাস নিয়ে বললেন, আমি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যিনি এক অদ্বিতীয় ন্যায়পরায়ণ ও সর্বশক্তিমান।

পেত্রোনিয়াস অবাক হয়ে পম্পেনিয়ার সেই বিশ্বাসভরা মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভিনিসিয়াস ও প্লতিয়াস সেখানে উপস্থিত হলেন।

পেত্রোনিয়াস ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভাগনেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রথে উঠে পেত্রোনিয়াস বললেন, লিজিয়া সত্যি অসাধারণ মেয়ে। ওকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল, ও যেন বসন্তের রানী।

ভিনিসিয়াস বললেন, লিজিয়া যদিও একজন বন্দিনী মেয়ে, কিন্তু

প্লতিয়াস তো তাকে নিজের মেয়ের মতো ছাখেন। আমিও তাকে বন্দিনী হিসাবে না দেখে যোগ্য মর্যাদাই দেব।

—কিভাবে?

—আমি লিজিয়াকে বিয়ে করবো। ভিনিসিয়াস উত্তেজিত গলায় বললেন, তুমি যদি ব্যবস্থা না করো, তাহলে আমি নিজেই যা হয় করবো। আমি তার জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত।

পেত্রোনিয়াস ভাগনের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, মাথা ঠাণ্ডা রাখো ভিনিসিয়াস, হঠাৎ কিছু করে বসো না।

—আমি কি করবো, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তোমাকে কিছুই করতে হবে না। যা করবার আমিই করবো।

—পারবে তো?

—শোন, আমার নাম মার্কাস পেত্রোনিয়াস আর মার্কাস পেত্রোনিয়াসের অভিধানে ব্যর্থতা বলে কোন কথা নেই। যাও এবার তুমি বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাওগে। পেত্রোনিয়াস ভিনিসিয়াসকে নামিয়ে দিয়ে ক্রাইসোথেমিসের বাড়ির দিকে চললেন।

*　　*　　*

প্লতিয়াসের প্রাসাদ যেন এক শান্তিনিকেতন। এই শান্তিনিকেতনের সবার মনেই অখণ্ড শান্তি।

কিন্তু এই শান্তিনিকেতনে হঠাৎ দেখা দিল অশান্তির তরঙ্গ।

ভিনিসিয়াস আর পেত্রোনিয়াস এ প্রাসাদ থেকে যাবার দুদিন পরে এ প্রাসাদের দরজায় উপস্থিত হল সামরিক পোশাক পরা পনেরোজন প্রিটোরিয়ান রক্ষীদলের একটি দল।

দ্বাররক্ষক ভিতরে গিয়ে তাদের কথা বলামাত্র পরিবারের মধ্যে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। সকলেই জানে, নীরোর এই প্রিটোরিয়ান রক্ষীদল সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। এরা হয় মৃত্যু আর না হয় ভয়ংকর বিপদের বার্তা বহন করে আনে।

সকলের ধারণা হল, নীরো কোন কারণে প্লতিয়াসের উপর রেগে গিয়ে তাকে মেরে ফেলতে চান। সেই মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এই রক্ষীদলের আগমন।

পম্পেনিয়া কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর দেহ আঁকড়ে ধরলেন। তাঁকে যেতে দেবেন না। লিজিয়া প্লতিয়াসের হাতের উপর মুখ রেখে কাঁদতে লাগল। বাচ্চা ছেলেটি বাবার টোগা টেনে ধরে রাখল। দাসদাসীর দল ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

প্লতিয়াস তাদের অনেক করে বুঝিয়ে বাইরে এলেন। তাকে দেখে রক্ষীদলের ক্যাপ্টেন এগিয়ে এসে বললেন, আমি মহামান্য সম্রাট নীরোর কাছ থেকে এক আদেশ বহন করে এনেছি, সেইসঙ্গে এনেছি তাঁর অভিনন্দন।

প্লতিয়াস বললেন, সম্রাটের অভিনন্দন পেয়ে আমি ধন্য। এবার তাঁর আদেশ বলুন।

—সম্রাট জানতে পেরেছেন যে একজন লিজিয়ান রাজার মেয়ে আপনার প্রাসাদে যুদ্ধ বন্দিনীরূপে বাস করছেন। এখন থেকে সম্রাট তাকে নিজের হেফাজতে রাখতে চান। আমি তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

বৃদ্ধ প্লতিয়াস পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, সম্রাটের এ আদেশ অমান্য করার অর্থ হল সবংশে মৃত্যু। কোন কথাই এরা শুনবে না। রক্ষীদল এখনই লিজিয়াকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে।

তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি লিজিয়াকে নিয়ে আসছি।

ভিতরে আসতেই পম্পেনিয়া বললেন, কি ব্যাপার? ওরা এসেছে কেন?

—ওরা এসেছে লিজিয়াকে নিয়ে যেতে, প্লতিয়াস লিজিয়ার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন। এই নিষ্পাপ ফুলের মতো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ জ্বালা করতে লাগল।

—লিজিয়া। পম্পেনিয়া লিজিয়াকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে বললেন, না না, তা হতে পারে না। এর থেকে ওর মরে যাওয়া ভালো।

—মা। মা। লিজিয়া পম্পেনিয়ার কোলের মধ্যে মুখ রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল, আমি যাবো না, যাবো না।

প্লতিয়াসের মতো কঠিন হৃদয় সেনাপতিও এই দৃশ্যে বিচলিত হলেন। ভাঙা গলায় বললেন, আমি যদি শুধু একা থাকতাম, তাহলে আমাকে বধ না করে কেউ লিজিয়াকে নিয়ে যেতে পারত না। কিন্তু আমি একা নই, আমার স্ত্রী পুত্র আছে। আমি মরলেও নীরোর ক্রোধের আগুনে ওদেরও পুড়ে মরতে হবে। লিজিয়া, মা, তোকে বিদায় জানাচ্ছি। তুই ওদের সঙ্গে চলে যা। আমি তোর সাথেই যাচ্ছি নীরোর কাছে দরবার করতে।

এই বলে চোখের জল লুকোতে তিনি চলে গেলেন পাশের ঘরে। পম্পেনিয়া লিজিয়ার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, লিজিয়া মা, মনে রাখিস, ধর্ম সব কিছুর উপরে। যদি ধর্ম বাঁচাবার জন্যে জীবন দিতে হয়, তাও দিস।

লিজিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলল। চোখের জলে তার অপরূপ সুন্দর মুখখানি ভেসে যাচ্ছে।

মুখ তুলে শান্ত গলায় বলল, মা আমি নীরোর প্রাসাদে যাবো। না গেলে তোমাদের সকলকেই মরতে হবে। যাবার আগে তোমাকে বলে যাই, ওখানে অসম্মানিত হবার আগে আমি মৃত্যু বরণ করবো।

ততক্ষণে চারধারে সব ঘিরে দাঁড়িয়েছে। লিজিয়া সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। আর সেই মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়াল আর্শাস। বিশাল দৈত্যের মতো চেহারা। আর্শাস লিজিয়ার সঙ্গে এখানে এসেছিল। লিজিয়ার দেখাশুনা করাই তার কাজ।

সে পম্পেনিয়াকে বলল, আমিও লিজিয়ার সাথে যাবো।

পম্পেনিয়া বললেন, তুমি তো লিজিয়ারই সেবক। কিন্তু তুমি ওর সাথে যাবে কি ভাবে? ওই রক্ষীদল তোমাকে যেতে দেবে কেন?

—আমি তা জানিনা, আর্শাস গম্ভীর গলায় বলল, আমি শুধু জানি আমি মোটা মোটা লোহার থাম সরু কাঠের মতো ভেঙে ফেলতে পারি। আমাকে আটকাবার সাধ্য কারও নেই। আমি লিজিয়ার সেবক।

ততক্ষণে প্লতিয়াস সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি বললেন, আর্শাস ঠিকই বলেছে। ও লিজিয়ার সেবক। সেই হিসাবে ও লিজিয়ার সাথে যাবে। আমি রক্ষীদলের ক্যাপ্টেনকেও সে কথা বুঝিয়ে বলছি।

তিনি লিজিয়াকে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে পম্পেনিয়া বললেন, একটু দাঁড়াও, আমি নীরোর প্রাসাদের কর্ত্রী আক্তির কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি। সে লিজিয়াকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে।

এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি আক্তিকে একটি চিঠি লিখে দিলেন। প্লতিয়াস সেই চিঠি নিয়ে দিলেন রক্ষীদলের ক্যাপ্টেনের কাছে।

ক্যাপ্টেন কথা দিলেন চিঠি তিনি পৌঁছে দেবেন আক্তির কাছে।

তারপর লিজিয়াকে তোলা হল একটি সুন্দর রথে।

দিদিকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ছোট ছেলেটি চীৎকার করে কাঁদতে লাগল।

রক্ষীদল যাত্রা করল নীরোর প্রাসাদের দিকে। আর্শাস চলল তাদের সাথে।

প্লতিয়াসও বেরিয়ে পড়লেন নীরোর প্রাসাদের উদ্দেশে। কিন্তু প্রাসাদে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হল না। শোনা গেল নীরো তখন গান গাইছেন। সঙ্গে বাঁশী বাজাচ্ছে তর্পিনস। এই সময় নীরো তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

প্লতিয়াস অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সমস্ত

ব্যাপারটার পিছনে আছে পেত্রোনিয়াসের অদৃশ্য হাত। পেত্রোনিয়াস হঠাৎ তার বাড়িতে এলেন, আর তার পরেই সম্রাট লিজিয়াকে নিজের হেফাজতে রাখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, এই দুটো ব্যাপার এক সূত্রে বাঁধা। সমস্ত কিছুর জন্যে পেত্রোনিয়াসই দায়ী।

পেত্রোনিয়াসের সঙ্গে দেখা করার আগে তাঁর ভাগনে ভিনিসিয়াসের সঙ্গে দেখা করা যাক।

এই ভেবে তিনি ভিনিসিয়াসের বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

সমস্ত কথা শুনে ভিনিসিয়াসের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল থরথর করে। নীরো লিজিয়াকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেছে! নীরো—

নীরোর প্রাসাদে মেয়েদের রক্ষা নেই।

ভিনিসিয়াস অস্থিরভাবে বললেন, এটা কার চক্রান্ত বলুন আমায়। হয় পৃথিবীতে সে থাকবে নয় আমি থাকবো।

—আমার মনে হয় পেত্রোনিয়াস! প্লতিয়াস ধীর কণ্ঠে বললেন।

—পেত্রোনিয়াস! ভিনিসিয়াসের মুখে আর কথা যোগাল না, আমার মামার এই কাজ।

ভিনিসিয়াসের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে বললেন, বুঝতে পারছি লিজিয়াকে দেখার পর মামা নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি। সম্রাটের হাতে লিজিয়ার মতো সুন্দরী মেয়েকে তুলে দিয়ে নিজের কোন কাজ করাতে চেয়েছেন। ঠিক আছে, লিজিয়ার যে অসম্মান করবে, আমার হাতে তার রক্ষা নেই, সে মামাই হোক আর নীরোই হোন। আপনি বাড়ি চলে যান সেনাপতি। আমি এক্ষুণি মামার সাথে বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি।

এই বলে ভিনিসিয়াস প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেলেন পেত্রোনিয়াসের বাড়ির উদ্দেশে।

ছুটতে ছুটতেই ভিনিসিয়াস চলে এলেন পেত্রোনিয়াসের প্রাসাদে।

দ্বাররক্ষীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে তিনি ভিতরে ঢুকলেন। পেত্রোনিয়াস কবিতা লিখছিলেন।

ভিনিসিয়াস তাঁর হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন।

তারপর বজ্রমুষ্টিতে মামার হাত ধরে বললেন, লিজিয়া কোথায়? তাকে নিয়ে কি করেছো তুমি?

পেত্রোনিয়াস ভাগনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে হাত ছাড়িয়ে নিলেন, ব্যাপার কি? এত রেগে গেলি কেন?

ভিনিসিয়াস হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, লিজিয়ার কিছু হলে আমি ছুরি দিয়ে তোমার কান কেটে ফেলবো।

পেত্রোনিয়াস বললেন, শান্ত হয়ে বোস আগে।

—লিজিয়া কোথায় আছে বলো।

—নীরোর প্রাসাদে। আমি গতকাল নীরোকে তুটি অনুরোধ করেছিলাম। একটি হল, প্লতিয়াসের বাড়ি থেকে তাকে তুলে এনে সম্রাটের হেফাজতে রাখা। তুই নম্বর হল, তারপর আমার ভাগনের হাতে তুলে দেওয়া।

ভিনিসিয়াস এবার ধপ করে বসে পড়লেন।

পেত্রোনিয়াস তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, একটা যখন হয়েছে, তখন দ্বিতীয়টাও হবে। লিজিয়াকে তুই পাবি।

—কি করে? লিজিয়া তো রয়েছে সম্রাটের প্রাসাদে।

—কাল সম্রাটের ওখানে একটা ভোজসভা আছে। লিজিয়াকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। আমি লিজিয়ার পাশেই তোর বসবার ব্যবস্থা করেছি।

ভিনিসিয়াস খুব খুশি হয়ে মামার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, আমি রাগের মাথায় তোমাকে যা তা বলেছি। আমাকে ক্ষমা করো।

পেত্রোনিয়াস তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, দূর পাগল। আমি কিছু মনে করিনি। এখন বাড়ি যা। কাল ভোজসভায় ঠিক মতো হাজির হবি।

॥ আক্তির কথা ॥

আক্তি নীরোর প্রাসাদের অন্দর মহলের কর্ত্রী। তিনিও অসামান্য সুন্দরী। নীরোকে তিনি ভালোবাসেন। তাঁর ভালোবাসা একেবারে খাঁটি। তিনি নীরোর কল্যাণ চান।

এককালে নীরোও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। আক্তিকে তখন কোন কিছুই অদেয় ছিল না। হয়তো আক্তিকে বিয়ে করে তাঁকেই তিনি রোম রাজ্যের রানী করতেন। আক্তিও মনে মনে রানী হবারই স্বপ্ন দেখতেন।

কিন্তু হায়। তাঁর সে স্বপ্নসাধ পপ্পিয়া আসবার পর থেকেই ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

পপ্পিয়া একজন সুন্দরী নর্তকী। নীরো তার লাস্যময়ী চেহারা ও নাচ দেখে পাগল হয়ে গেলেন। পপ্পিয়াকে মনে করলেন বিশ্বের সবচেয়ে গুণবতী ও রূপবতী নারী। তাকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন।

নীরোর বুদ্ধিশুদ্ধি কোনকালেই বিশেষ ছিল না। যেটুকু ছিল পপ্পিয়াকে দেখার পর তাও লোপ পেল।

পপ্পিয়ার কথায় তিনি নিজের মা আগ্রিপিনা আর স্ত্রী অক্টোভিয়াকে হত্যা করলেন।

নীরোর মতো পপ্পিয়াও নিষ্ঠুর দানবী। তার বাইরের সুন্দর রূপের আড়ালে আছে এক ভয়ংকর ঘৃণ্য কদাকার কুটিল রূপ। এখন পপ্পিয়াই সর্বময়ী কর্ত্রী। তার ইচ্ছেতেই নীরো চলেন।

আক্তি এখন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। নীরোর কোন ব্যাপারে থাকেন না।

তিনি নবপ্রচারিত খ্রীষ্ট ধর্মের অনুরাগী হয়ে পড়েছেন। রোমের

মধ্যে খ্রীষ্টধর্মানুরাগীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। নীরো এই নতুন ধর্মের প্রতি খড়্গহস্ত। খ্রীষ্টধর্মকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাই রোমের খ্রীষ্টানদের প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ করবার কোন উপায় নেই। তারা গোপনে ঈশ্বরের আরাধনা করে। মাছের ছবি এঁকে তারা নিজেদের পরিচয় জানায়।

খ্রীষ্টধর্মের অনুরাগী হবার পর আন্তির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রোমের হতভাগ্য গরীব খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ ছিল।

নীরোর রাজপ্রাসাদে লিজিয়াকে দেখে তার মন ব্যথায় ভরে যায়। আহা! এমন ফুলের মতো সুন্দর মেয়ে! নীরোর হাতে পড়ে এ তো শেষ হয়ে যাবে।

পম্পেনিয়ার চিঠি পেয়ে তিনি মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলেন, যে করেই হোক এই মেয়েটিকে নীরোর কবল থেকে রক্ষা করতে হবে।

লিজিয়াকে কাছে ডেকে তিনি মিষ্টি করে কথা বলতে লাগলেন। তবু লিজিয়ার ভয় যায় না। নীরোর প্রাসাদে এসে এখানকার জাঁকজমক আর ব্যাপার স্যাপার দেখে সে বুঝতে পেরেছে যে এখান থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

আন্তি কিছুতেই তার ভয় ভাঙাতে পারেন না। শেষে তিনি তাকে সাজাবার সময় প্রসাধনের রঙ দিয়ে মাছের ছবি আঁকলেন।

মাছের ছবির দিকে তাকিয়ে লিজিয়ার লুপ্ত সাহস এক মুহূর্তে ফিরে এল। মাছের ছবি যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

পরম বিশ্বাসে লিজিয়া আন্তিকে আঁকড়ে ধরল।

লিজিয়ার পিঠে হাত রেখে আন্তি বললেন, সম্রাটের ভোজসভা শুরু হয়ে যাবে। তোমাকে সেখানে উপস্থিত থাকবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

—আমি যাবো না। লিজিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল।

আন্তির মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠল।

তিনি বললেন, নীরোর আদেশ লঙ্ঘন করবার একটাই শাস্তি—তা হল মৃত্যু।

—হোক মৃত্যু। তবু আমি যাবো না।

—পাগলামো করো না। আক্তি অভয় দিয়ে বললেন, তুমি ভোজসভায় যাও। আমি বলছি, আপাতত নীরোর কাছ থেকে তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই। নীরোর একটি সন্তান হয়েছে। সে এখন তার রানী পপ্পিয়া আর বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত।

—ভোজসভায় আমি তো কাউকে চিনি না।

—কেন পেত্রোনিয়াস, সেনেকা এদের তো তুমি চেনো। এরা সবাই আসবেন।

লিজিয়া একটু ইতস্তত করে বলল, আর কেউ?

আক্তি একটু অবাক হয়ে বললেন, আর কাকে তুমি আশা কর?

—মার্কাস ভিনিসিয়াস। নীরোর সেনাপতি। তিনি সম্প্রতি আর্মেনিয়া যুদ্ধ জয় করে ফিরেছেন।

—নীরো তাকে পছন্দ করেন?

—মার্কাসকে সকলেই ভালোবাসে।

—তাহলে নিশ্চয় মার্কাসকে তুমি এই ভোজসভায় দেখতে পাবে। আক্তি হেসে বললেন, আর দেখা হলে বলো, তিনি যেন তোমার মুক্তির জন্যে সম্রাটকে বলেন।

লিজিয়া এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সাজতে বসল।

সাজগোজ হলে আক্তি তাকে পরিচারিকার সঙ্গে ভোজসভায় পাঠিয়ে দিলেন।

॥ নীরোর ভোজসভা ॥

নীরোর ভোজসভার হল ঘরটি বিশাল। রাজ্যের হাজার হাজার গণ্যমান্য ব্যক্তি ভোজসভায় নিমন্ত্রিত। হলঘরটির দেয়াল বহুবর্ণ মর্মরে মণ্ডিত। মাথার উপর আকাশের মতো নীলাভ ছাদ—সেখানে

নানা জায়গায় নক্ষত্রের মতো দীপাধার। কোণে কোণে সুদৃশ্য মশাল—সুগন্ধে চারদিক সুরভিত।

হলঘরটির মাঝখানে বিশাল এক জলাধার। জলাধারের উপর রঙীন ফোয়ারার জল উপচে পড়ছে। চারধারে নানা বর্ণের ফুলের সাজ।

হলঘরের দেওয়ালের ধারে ধারে মখমলে মোড়া সোফায় রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বসে। হাতে সুরার পাত্র।

হঠাৎ সৈনিকদের ভেরী বেজে উঠল। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রে ঝংকার শোনা গেল।

অন্তরঙ্গ পারিষদদের নিয়ে নীরো প্রবেশ করলেন। তার পাশে সম্রাজ্ঞী পপ্পিয়া। পপ্পিয়ার পিছনে তার দুই পোষা চিতা বাঘ। চিতা বাঘের গলায় সোনার শিকল ধরে আছে কাফ্রী দাস। নীরো আসবার সঙ্গে সঙ্গে ঐকতান বাজনা বেজে উঠল। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

নীরো গর্বিত পদক্ষেপে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট মহামূল্যবান সিংহাসনে বসলেন। সুন্দরী ক্রীতদাসী তাঁর হাতে তুলে দিল সুরার পাত্র। এবার অসংখ্য সুন্দরী তরুণী ভোজসভার প্রতিটি টেবিল নানা ধরনের লোভনীয় খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ করে দিল। রঙ্গীন গেলাসে অফুরন্ত পানীয়।

লিজিয়া একধারে একটি আসনে বসে অবাক হয়ে সব দেখছিল। এত জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের দীপ্তি দেখে সে যেন হতভম্ব।

হঠাৎ তার পাশে কে যেন বলে উঠল, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

লিজিয়া চমকে তাকিয়ে দেখল, মার্কাস ভিনিসিয়াস তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ভোজসভার ঝকমকে সাজপোশাকে মার্কাসকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

লিজিয়া হেসে বলল, তোমাকেও আমি অভিনন্দন জানাই মার্কাস। ভিনিসিয়াস লিজিয়ার পাশের সোফায় বসে বলল, তোমাকে এখানে দেখতে পেয়ে আমার যে কি ভালো লাগছে, তা বলে বোঝাতে পারবো না।

—আমি নীরোর প্রাসাদে এসেছি তুমি জানলে কি করে?

—আমি প্লতিয়াসের কাছে সব শুনেছি। যাক, তুমি আর ভয় করো না। তুমি আমার প্রাণ। আমি তোমার পাশে থাকতে তোমার কোন ভয় নেই।

—আমি নীরোর প্রাসাদে থাকতে চাই না।

—নীরোর প্রাসাদে তোমাকে থাকতে হবে না। ভিনিসিয়াস হেসে বলল, তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমি করব। আমার প্রাণ থাকতে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ভিনিসিয়াসের মধুর আশ্বাসবাণী শুনে লিজিয়ার চোখ জলে ভরে এল। সত্যি। মানুষ এত ভালো হয়। এদিকে কয়েক পাত্র সুরা পান করে ভিনিসিয়াসের মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

লিজিয়ার চোখে জলের রেখা দেখে তিনি অস্থির কণ্ঠে বললেন, কেঁদো না লিজিয়া, আমি তোমায় ভালবাসি। আমি থাকতে কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

আক্তি একটু দূরে বসেছিলেন।

তিনি এবার একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, এই—তোমরা সাবধানে কথা বলো। নীরো তোমাদের লক্ষ্য করছেন।

ভিনিসিয়াস আর লিজিয়া দুজনেই নীরোর দিকে তাকাল।

লিজিয়া অবাক হয়ে নীরোর দিকে তাকিয়ে রইল।

এই সেই প্রবল প্রতাপান্বিত রোমান সম্রাট নীরো? লিজিয়ার মনে হল, সে যেন একটা ভয়ংকর ড্রাগনকে দেখছে। বিশাল একটি ঘাড়ের উপর অদ্ভুত বড় একটি মুখ বসানো। মাথার ঢেউ খেলানো চুল

সুন্দর করে আঁচড়ানো। ভ্রূর উপর থেকে প্রশস্ত কপাল উঠে গেছে। এদিকে ভোজসভা তখন খুব জমে উঠেছে।

অতিথিরা নানা ধরনের খাদ্য আর মদ খেয়ে একেবারে বেসামাল।

নীরো এতক্ষণ এক চোখ অর্ধেক বুঁজে লিজিয়ার দিকে তাকিয়েছিলেন আর সুরার পাত্রে চুমুক দিচ্ছিলেন।

এবার তাঁর স্তাবকবৃন্দ চেঁচিয়ে বললেন, প্রভু সীজার এবার আমাদের দয়া করে গান শুনিয়ে ধন্য করুন।

নীরো এমন একটা ভাব দেখালেন যে এসব গানটান করতে তাঁর একেবারেই ইচ্ছে নেই। এবার অতিথিরা আবার বললেন, হে মহামান্য সীজার, আমাদের প্রতি করুণা দেখান। দয়া করে গান শুনিয়ে ধন্য করুন।

নীরো এবার উঠে দাঁড়িয়ে হাতখানি সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। তাঁর মনোভাব এই যে তিনি যেন অতিথিদের অনুরোধে বাধ্য হয়ে গান শোনাচ্ছেন।

এরপর নীরো গান ধরলেন।

অতি সাধারণ গান। বেসুরো।

কিন্তু অতিথিরা সেই সাধারণ গানই এমন মনোযোগ দিয়ে শুনলেন যেন তারা স্বর্গীয় কোন গান শুনছেন। গান শুনতে শুনতে সবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আহা। এমন গান কেউ জীবনে শোনেনি। অতিথিদের উপর গোলাপ ফুলের বৃষ্টি হতে লাগল। এরপর প্যারিস নামে এক অভিনেতা সুন্দর অভিনয় করে দেখালেন। সিরিয়ার নর্তকীরা নাচতে নাচতে ঢুকল। নাচের সঙ্গে বাজতে লাগল নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

এরপর শুরু হল কুস্তি। বিশাল দেহী ক্রোটন রাজ্যের সেরা কুস্তিগীর। প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক কুস্তিগীরের সঙ্গে তার কুস্তি অতিথিরা হাঁ করে দেখলেন। দৈত্যের মতো বলশালী ক্রোটন যখন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকে পা দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তখন হাততালিতে কেঁপে উঠল হলঘর।

হলঘরের সকল অতিথিই অতিরিক্ত মাত্রায় সুরাপান করে বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন।

ভিনিসিয়াসও প্রচুর মাত্রায় মদ্য পান করে মাতাল হয়ে পড়লেন। তিনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে লিজিয়াকে বললেন, তুমি আমার, হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে আমার। নীরো তোমার বাবার কাছ থেকে তোমাকে নিয়ে এসেছে কেন জানো ? নিয়ে এসেছে আমাকে দেবার জন্যে। তুমি আমার সম্পত্তি। আমি তোমাকে নিয়ে যা খুসি তাই করতে পারি।

লিজিয়া ভিনিসিয়াসের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভিনিসিয়াসের এই সুন্দর চেহারার আড়ালে তার লোভী কুৎসিত রূপ দেখে সে শিউরে উঠল।

তার ধারণা ছিল, সে একজন সুন্দর দেবতাকে ভালোবেসেছে।

কিন্তু দেবতা কোথায় ? এ যে এক কুৎসিত লোভী পুরুষ।

লিজিয়া বিষণ্ণ চোখে ভিনিসিয়াসের দিকে তাকাল। মদ খেয়ে ভিনিসিয়াসের কোন মাত্রা জ্ঞান ছিল না। তিনি জোর করে লিজিয়াকে তাঁর কাছে টেনে নিলেন। আর সেই সময় একটা লোহার মতো হাত এসে তাঁর হাত মুচড়ে দিয়ে তাঁকে শুকনো পাতার মতো পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ভিনিসিয়াস কোনমতে সামনে চোখ খুলেই দেখতে পেলেন, সামনে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে আর্শাস। ভিনিসিয়াস সেই জীবন্ত দৈত্যের পানে তাকিয়ে আর উঠবার সাহসই পেলেন না।

আর্শাস একটা বাচ্চা মেয়ের মতো লিজিয়াকে তুলে নিয়ে হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ভিনিসিয়াস চেঁচিয়ে ডাকলেন, লিজিয়া, লিজিয়া। তাঁর ডাক শুনে একটি সুন্দরী দাসী এসে তাঁর হাতে আবার সুরার পাত্র তুলে দিল।

ভিনিসিয়াস সেই সুরা আকণ্ঠ পান করে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লেন।

শুধু ভিনিসিয়াস নন, হলঘরের সকলেই তখন সুরা পান করে মেঝের

উপর লুটোচ্ছেন। ভোজসভার অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত সব জ্ঞানী গুণী, দার্শনিক, নাইট, কবি, রাজপুরুষ প্রভৃতি। তাঁরা সবাই সুরা পান করে নর্তকী আর অভিজাত ঘরের মহিলাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন, আর সামলাতে মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। নীরোর ভোজসভায় সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

॥ লিজিয়া হরণ ॥

আত্তি সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন।

তিনি আর্শাসকে ইঙ্গিত করে নিজের মহলের দিকে এগোতে লাগলেন।

আর্শাস একটা শিশুর মতো লিজিয়াকে হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আত্তির মহলের দিকে এগোতে লাগল।

আত্তির মহলটা ছিল মূল প্রাসাদের অনেকটা ভিতরে। সেখানে বিশেষ কারো যাতায়াত নেই।

আত্তির মহলে পৌঁছে আর্শাস লিজিয়াকে সাবধানে বসিয়ে দিল একটা সোফায়।

লিজিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাকে মার কাছে নিয়ে চলো আর্শাস। আমি মার কাছে যাবো।

আত্তি লিজিয়াকে সান্তনা দিয়ে বললেন, অধীর হয়ো না লিজিয়া। এখন প্লতিয়াসের বাড়িতে গেলে তুমি তো মরবেই, তোমার বাবা মা ভাই—কেউই নীরোর কোপ থেকে রেহাই পাবে না। ওখানে তোমার কোনমতেই যাওয়া চলবে না।

লিজিয়া বেঁকে বসল, তাহলে আমি কোথায় যাবো?

আত্তি বললেন, ভিনিসিয়াসের বাড়িতে তুমি হয়তো নিরাপদে থাকতে পারবে।

লিজিয়ার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। চোখে আগুন এনে বলল, সেই ইতর বর্বর জানোয়ারের বাড়িতে? মরে গেলেও না। এখন আমি বুঝতে পারছি আমার সকল দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী কে?

—তুমি ভিনিসিয়াসকে এত ঘেন্না করো?

—না আমি তাকে ঘেন্না করি না। কিন্তু তার ব্যবহারে করতে বাধ্য হচ্ছি।

—আমি জানি লিজিয়া। তুমি একজন খাঁটি খ্রীষ্টান। পলের শিষ্যদের কাছ থেকে শুনেছি, তুমি অসম্মানিত হবার চেয়ে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুমি যাবে কোথায়? যেখানেই যাও নীরোর ভয়ংকর ক্রোধের আগুন থেকে রেহাই পাবে না।

লিজিয়া হতাশ হয়ে আত্তির পায়ের উপর আছড়ে পড়ল, আপনি আমাকে বাঁচান।

আত্তি অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকেন লিজিয়ার দিকে। তিনি কি করে বাঁচাবেন এই ফুলের মতো পবিত্র মেয়েটিকে। নীরোর ক্রোধ বড় ভয়ংকর। তাঁর ক্রোধ আর লোভের আগুনে এই পবিত্র মেয়েটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কিন্তু তিনি কি করতে পারেন? তিনিও তো অসহায়। নিজের অসহায়তার কথা ভেবে তাঁর চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ল।

দৈত্যের মতো দেহ নিয়ে আর্শাস এগিয়ে এল।

—আমি তোমাকে বাঁচাবো। আর্শাসের গলার স্বরে যেন মেঘের গর্জন, আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতে তোমার কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।

আত্তি আর্শাসের হাত ধরে বললেন, আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম আর্শাস, আজ থেকে তুমি লিজিয়ার বাবা। তুমি ওকে নগর থেকে দূরে ক্রীশ্চানদের যে বসতি আছে, সেখানে নিয়ে গিয়ে ওকে লুকিয়ে রাখো। তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

আর্শাস বলল, আমি লিজিয়াকে নিরাপদে ক্রীশ্চানদের বসতিতে নিয়ে যাবো। কোন ভয় নেই।

আক্তি বললেন, তুমি ঈশ্বরের দূত আর্শাস। তোমার কথায় আমি মস্ত ভরসা পেলাম।

আক্তির কথায় লিজিয়া এবার কিছু ভরসা পেল।

আক্তি আর্শাসকে বললেন, তুমি এখন বাইরে যাও। লিজিয়া খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করুক। সময় হলেই তোমাকে খবর পাঠাবো। তুমি এসে লিজিয়াকে নিয়ে যাবে।

আর্শাস বাইরে চলে গেল।

পরদিন সকালে আক্তি লিজিয়াকে রাজকীয় উদ্যানে নিয়ে গেলেন।

উদ্যান দেখে তো লিজিয়া অবাক। অজস্র ফুলগাছে নানা রকমের ফুল ফুটে আছে। সাইপ্রেস, পাইন, ওক, ওলিক গাছের কেয়ারি। এর মাঝে মাঝে পাথরের মূর্তি।

লিজিয়া অবাক চোখে সব দেখছিল।

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন সম্রাজ্ঞী পপ্পিয়া। সঙ্গে তার একজন ক্রীতদাসী। একজন কাফ্রী দাসীর কোলে সম্রাজ্ঞীর শিশু কন্যা।

পপ্পিয়া আক্তিকে বললেন, আক্তি, তুমি আমার বাচ্চার পুতুলে যে ছোট ছোট ঘণ্টা সেলাই করে দিয়েছিলে, সেগুলি ভালো করে সেলাই করা হয়নি। বাচ্চা একটা ঘণ্টা ছিঁড়ে মুখে পুরে বিপদ বাধিয়ে দিয়েছিল আর কি।

আক্তি তাড়াতাড়ি মাথা নত করে বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন মহারানী।

পপ্পিয়া এবার লিজিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ মেয়েটি কি ক্রীতদাসী?

—না মহারানী, এ মেয়েটি লিজিয়ার রাজকন্যা। এখন রোমে যুদ্ধ বন্দিনী।

— এ মেয়েটি এখানে এসেছে কেন ? এ কি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে ?

—না মহারানী, এ প্রাসাদে বাস করতে এসেছে।

—কার আদেশে ?

—সম্রাট নীরোর আদেশে।

পপ্পিয়া এবার ভালো করে লিজিয়ার দিকে তাকালেন।

লিজিয়ার অপূর্ব রূপ দেখে তার চোখের পলক পড়ে না। তার চোখের তারায় ঈর্ষার কালো ছায়া।

এবার লিজিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই, সম্রাটের সঙ্গে তুই কোন কথা বলেছিলি ?

—না মহারানী।

—তুই এই প্রাসাদ ছেড়ে নিজের বাড়িতে যেতে চাস ?

—হ্যাঁ মহারানী।

—ঠিক আছে, তোকে আসল জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

লিজিয়ার দিকে কুটিল চোখে তাকিয়ে পপ্পিয়া গর্বিত পা ফেলে চলে গেলেন।

আক্তি কাতরস্বরে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেল। শয়তানী তোমাকে দেখে গেল। এবার যমের বাড়ি না পাঠিয়ে ও শান্তি পাবে না। শীগগীর চল এখুনি পালাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি লিজিয়াকে নিয়ে নিজের মহলে ঢুকলেন।

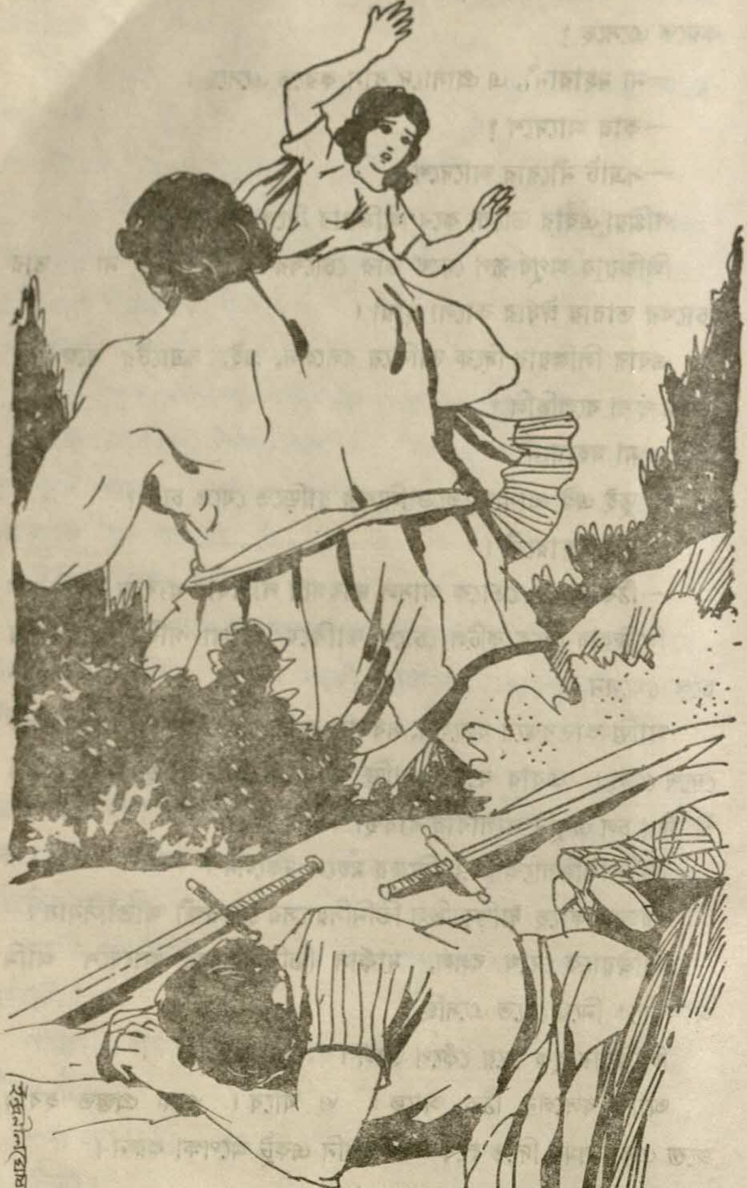
দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল ভিনিসিয়াসের দেহরক্ষী আতাসিনাস।

লিজিয়াকে দেখে বলল, মার্কাস ভিনিসিয়াসের আদেশে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

লিজিয়ার বুক ভয়ে কেঁপে উঠল।

আক্তি বললেন, ঠিক আছে। ও যাবে। ওকে প্রস্তুত হবার জন্যে একটু সময় দিতে হবে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

আতাসিনাস অপেক্ষা করতে লাগল।



আন্তি লিজিয়াকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

দরজা বন্ধ করে ফিসফিস করে বললেন, ভয় নেই। তুমি আতাসিনাসের সাথে চলে যাও। আমি আর্শাসকে খবর পাঠাচ্ছি। সে তোমাকে ঠিক উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবে।

লিজিয়া কাঁদতে কাঁদতে আন্তির কাছে বিদায় নিল।

তারপর বাইরে বেরিয়ে এল আন্তির সঙ্গে।

তার জন্যে সুন্দর একটি শিবিকা সাজিয়ে আনা হয়েছিল ভিনিসিয়াসের বাড়ি থেকে।

লিজিয়া সামনে যেতেই ভিনিসিয়াসের রক্ষীদল সসম্ভ্রমে তাকে সেলাম করে সরে দাঁড়াল।

লিজিয়া শিবিকায় ঢুকে পড়ল। তার সামনে নেটের আবরণ।

আতাসিনাসের নির্দেশে বাহকগণ শিবিকা তুলে নিয়ে রোমের রাজপথ দিয়ে এগোতে লাগল ভিনিসিয়াসের বাড়ির দিকে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল।

শিবিকা যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, সে পথে বিশেষ আলো ছিল না।

আলো আঁধারি পথে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো লোকজন যাতায়াত করছে। এরা যেন শিবিকার খুব কাছে চলে আসছে।

লিজিয়ার মন অস্থির।

এই বুঝি আর্শাস আসে।

কিন্তু কোথায় আর্শাস। তবে কি আর্শাস খবর পায়নি ?

দুঃখে ক্ষোভে লিজিয়ার মন ভেঙে পড়ে। হায়। এবার আর তার বাঁচবার কোন আশাই নেই।

চোখে জল নিয়ে লিজিয়া প্রার্থনা করে :

হে খ্রীষ্ট, আমাকে রক্ষা করো। হে খ্রীষ্ট।···

ঠিক সেই সময় শিবিকার সামনের দিকটায় গোলমাল বেধে গেল। রক্ষীদল শুরু করল চেঁচামেচি।

বাহকরা শিবিকা নামিয়ে রেখে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। আতাসিনাস বুঝতে পারল, তাদের শিবিকার উপরে আক্রমণ হয়েছে। এখন লিজিয়াকে নিয়ে সরে পড়াই ভালো।

সে তাড়াতাড়ি শিবিকার কাছে গিয়ে লিজিয়ার হাত ধরে তাকে টেনে বের করল।

লিজিয়া ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আর্শাস, আর্শাস।

আতাসিনাস লিজিয়াকে হ্যাঁচকা টান মারতে যাবে, এমন সময় লোহার মতো একটি হাত এসে তার ঘাড় চেপে ধরল। আতাসিনাস কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক ঘুষিতে তার চোয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

দৈত্যের মতো সামনে এসে দাঁড়াল আর্শাস। শিশুর মতো লিজিয়াকে দুহাতে তুলে নিয়ে মিশে গেল অন্ধকারে। পেছনে পড়ে রইল আতাসিনাসের মৃতদেহ, ভাঙা শিবিকা আর রক্ষীদের আহত দেহ।

॥ লিজিয়া কোথায় ॥

এদিকে ভিনিসিয়াস অধীর আগ্রহে লিজিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এই বুঝি লিজিয়া এলো। ওই বুঝি শিবিকাবাহকদের কথা শোনা যায়। ওই বুঝি লিজিয়া শিবিকা থেকে নামছে।

কিন্তু কোথায় লিজিয়া।

ভিনিসিয়াস শুধু উপর নীচ করতে লাগলেন। তাঁর অস্থিরতা দেখে পেত্রোনিয়াস হেসে বললেন, অস্থির হয়ো না ভিনিসিয়াস। লিজিয়া ঠিক সময়েই আসবে। সেই সময় কয়েকজন ক্রীতদাস সেখানে টলতে টলতে ঢুকল। তাদের সারা দেহ রক্তাক্ত। হাত উঁচুতে তোলা।

ভিনিসিয়াস তাদের দিকে ফিরে বললেন, লিজিয়া কোথায়? ক্রীত দাসদের মুখ দিয়ে শুধু যন্ত্রণাকাতর গোঙানি বেরিয়ে এল, আ—আ—আ।

ভিনিসিয়াস এবার চেঁচিয়ে বললেন, লিজিয়া কোথায় বল।

এবারও সেই গোঙানি, আ—আ—আ—

ভিনিসিয়াস বুঝতে পারলেন, লিজিয়াকে ওরা আনতে পারেনি। ভীষণ রেগে গিয়ে সামনের ক্রীতদাসটার মুখে পিতলের ভারী বাতিদানটা ছুঁড়ে মারলেন। ক্রীতদাসটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

অন্য ক্রীতদাসরা কাতর আর্তনাদ করে বলল, প্রভু দয়া করুন, প্রভু দয়া করুন।

লিজিয়াকে না পেয়ে ভিনিসিয়াস যেন পাগল হয়ে গেলেন। তিনি রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। চোখ আগুনের গোলার মতো লাল। মুখ দিয়ে ফেনা পড়তে লাগল। আর সামনে যে পড়ল, তাকেই পিটতে লাগলেন। আর পাগলের মতো বলতে লাগলেন, আজ সবাইকেই মেরেই ফেলবো, মেরেই ফেলবো।

তাঁর ওই ভয়ংকর মূর্তি দেখে পেত্রোনিয়াস আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ভিনিসিয়াস একটু শান্ত হলেন।

লিজিয়াকে কে কোথায় নিয়ে গেল, এই চিন্তাই তাঁকে পেয়ে বসল।

প্রথমে মনে হল, নীরো বোধহয় লিজিয়াকে হরণ করে নিয়ে গেছে। কারণ সুন্দরী মেয়েদের লুট করে নেওয়া নীরোর একটা মজার খেলা। সেই লুটকরা সুন্দরী মেয়েদের সৈনিকদের পোশাকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। সৈনিকদের মার্চ করার সময় মেয়েটির শরীর দুলত। আর নীরো প্রাণভরে এই দৃশ্য উপভোগ করতেন। হয়তো নীরো লিজিয়াকেও এই জন্যে হরণ করে নিয়ে গেছেন।

কথাটা মনে হতেই ভিনিসিয়াসের রক্ত গরম হয়ে উঠল। যদি সত্যি সত্যি এরূপ ঘটে থাকে, তাহলে তিনি নীরোকে খুন করবেন।

ভিনিসিয়াস অধীর উত্তেজনায় ছুটলেন নীরোর প্রাসাদের দিকে।

প্রাসাদের দ্বাররক্ষী ভিনিসিয়াসের পথ আটকাল।

—আমি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—সম্রাটের শিশুকন্যার খুব অসুখ। সম্রাট সম্রাজ্ঞী এখন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলছেন। দেখা হবে না।

—আমি আক্তির সঙ্গে দেখা করবো তাহলে।

—ঠিক আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি ডেকে পাঠাচ্ছি। দ্বাররক্ষী অন্দরমহলের প্রতিহারীকে দিয়ে আক্তির কাছে খবর পাঠাল। আক্তি ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ভিনিসিয়াস উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, লিজিয়া কোথায়?

আক্তি ভিনিসিয়াসের ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মুখ দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

তিনি ওর হাত ধরে বললেন, চল। নিরালায় বসে আমরা একটু কথাবার্তা বলি।

ভিনিসিয়াসকে নিয়ে তিনি একটু নিরালা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, কি ঘটেছে বলো।

—লিজিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে। আমার মনে হয়, এটা ওই নীরোর কাজ।

আক্তি মাথা নাড়লেন, না, আমি শপথ করে বলতে পারি, এটা নীরোর কাজ নয়। মেয়ের অসুখে নীরো এখন পাগলের মতো হয়ে গেছে। অন্য দিকে মন দেবার মত অবস্থা তার নেই। সর্বক্ষণ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলছে।

—তাহলে লিজিয়াকে কে ধরে নিয়ে গেল?

—লিজিয়াকে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি, আক্তি মৃদুকণ্ঠে বললেন, লিজিয়া স্বেচ্ছায় তোমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।

—কেন? ভিনিসিয়াস অবাক হয়ে বললেন।

—যেহেতু তুমি লিজিয়াকে জোর করে পেতে চেয়েছ, কিন্তু লিজিয়া ওভাবে তোমার কাছে যেতে চায়নি। অসম্মানের জীবন যাপন করবার ভয়ে সে চলে গেছে।

ভিনিসিয়াস রেগে বললেন, যেখানেই যাক আমি তাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসবোই।

—গোঁয়াতুর্মি করো না। আত্তি গম্ভীরভাবে বললেন, এর মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, সেটা তোমাকে জানানো দরকার। কাল নীরোর স্ত্রী পপ্পিয়া যখন বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন লিজিয়ার সাথে দেখা হয়েছিল। এরপরই বাচ্চাটা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পপ্পিয়া নীরোকে বলেছে যে মেয়েটা মন্ত্র দিয়ে বাচ্চাটার অসুখ এনেছে। এখন বাচ্চাটা সুস্থ হয়ে উঠলে মঙ্গল। বাচ্চাটা সুস্থ না হলে নীরো লিজিয়াকে খুঁজে বের করে শেষ করে ফেলবে।

ভিনিসিয়াস হতাশ হয়ে বললেন, শেষ করে ফেলুন। তাতে আমার কি।

আত্তি হেসে বললেন, তুমি তাহলে লিজিয়াকে ভালোবাসো না!

ভিনিসিয়াসের কণ্ঠে বিরক্তি, বাসলে কি হবে। ও তো আমাকে ঘেন্না করে।

আত্তি বললেন, তুমি একটা বুদ্ধু। যুদ্ধ করে শুধু শত্রু জয় করতেই শিখেছ, মেয়েদের মন জয় করতে শেখনি। লিজিয়া তোমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসে।

—সে কি? কই আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।

—তুমি বুঝবে কি করে। তুমি তাকে সম্মান দাওনি—তাকে অমর্যাদা করে জোর করে পেতে চেয়েছ। তাই তাকে হারিয়েছ।

ভিনিসিয়াস নীরব হয়ে গেলেন। আত্তির কথাগুলো যেন তাঁর মর্মলোকে গেঁথে যাচ্ছে। সত্যিই তিনি বড় খারাপ আচরণ করেছেন লিজিয়ার সাথে। সেই অভিমানেই লিজিয়া চলে গেছে, এখন কি করা যায়?

ভিনিসিয়াসকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আত্তি কোমল স্বরে বললেন, শোন ভিনিসিয়াস, আমি জানি, তুমি লিজিয়াকে খুব ভালোবাসো। লিজিয়াকে তুমি খুঁজে বের করো। ওকে যোগ্য

মর্যাদা দাও। তোমরা সুখী হবে।

ভিনিসিয়াস আত্তির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নতমুখে বেরিয়ে গেলেন।

তার মন জুড়ে আছে লিজিয়া।

কোথায় গেলে লিজিয়ার দেখা পাওয়া যাবে? কোথায় আছে লিজিয়া?

ভিনিসিয়াস এরপর নানাভাবে লিজিয়ার খোঁজ করলেন। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেলেন না।

মামা পেত্রোনিয়াসও তাঁকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। খোঁজ খবর নেবার পর পেত্রোনিয়াস এই সিদ্ধান্তে এলেন যে লিজিয়া এখনও রোমের বাইরে যায়নি। রোমের সীমান্ত প্রহরীর দল লিজিয়ার মতো কোন মেয়েকে রোমের বাইরে যেতে দেখেনি।

পেত্রোনিয়াস ভাগনেকে বললেন, ছাখ ভিনিসিয়াস, এই রোমের বস্তি অঞ্চলে চিলোন নামে একটা লোক আছে। সে সম্ভবত লিজিয়ার খোঁজ এনে দিতে পারবে।

—চিলোন কে?

—শুনেছি লোকটা যাত্থবিদ্যা জানে, নানা রোগভোগের টুকটাক চিকিৎসা করে, আর ভালো একজন গণৎকার। লিজিয়া কোথায় আছে তা সে বলে দিতে পারবে হয়তো।

—তুমি কার কাছ থেকে এই চিলোনের কথা শুনলে মামা?

—আমি শুনেছি আমার ক্রীতদাসী ইউনিসের কাছ থেকে। ইউনিস চিলোনের সঙ্গে দেখা করেছিল তার নিজের কোন ব্যাপারে।

—তাহলে ইউনিসের কাছ থেকে চিলোনের ঠিকানাটা নিয়ে আমাকে দাও। আমি এক্ষুণি চিলোনের সাথে দেখা করবো।

ভিনিসিয়াসের ব্যগ্রতা দেখে পেত্রোনিয়াস হেসে বললেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি উড়ে যেতে পারলে খুশি হতে।

—লিজিয়ার জন্যে আমি নরকে যেতেও প্রস্তুত।

—আমি ইউনিসের কাছ থেকে চিলোনের ঠিকানা এনে দিচ্ছি।

পেত্রোনিয়াস ভিতরে গিয়ে চিলোনের ঠিকানা নিয়ে এলেন। ভিনিসিয়াস ছোঁ মেরে ঠিকানাটা তুলে নিয়ে পড়ে দেখলেন।

—মনে হচ্ছে এটা রোমের একটা বস্তি অঞ্চল। ঠিক আছে, আমি এক্ষুণি সেখানে যাচ্ছি।

ভিনিসিয়াস ব্যস্তভাবে পেত্রোনিয়াসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

॥ সবজান্তা চিলোনের ডেরায় ॥

রোমের এক ঘিঞ্জি বস্তি অঞ্চলের একটা ভাঙা বাড়িতে বিলোনের বাস।

ভিনিসিয়াস খুঁজে খুঁজে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। চিলোনের ঘরের মধ্যে নানান ধরনের জিনিস। কত রকমের শিকড় বাকড় গাছের ছাল। জীবজন্তুর হাড় কংকাল চামড়া। ভিনিসিয়াসের মনে হল, তিনি যেন আদিম মানবের কোন গুহায় এসে পড়েছেন।

চিলোনের চেহারাটাও আদিম মানুষের মতো। মাথাটা বিরাট। মুখটা যেন শেয়াল আর বানরের মুখ মিশিয়ে তৈরী। সারা মুখ দাড়ি গোঁফে ভর্তি। মাথায় লম্বা চুল।

ভিনিসিয়াসকে দেখে চিলোন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে হাসতে বলল, আসুন আসুন মার্কাস ভিনিসিয়াস, আপনি যে জন্যে এসেছেন, আমি তার সব ব্যবস্থা করে দেবো।

ভিনিসিয়াস অবাক হয়ে বললেন, আমি কি জন্যে এসেছি তুমি জানো?

—খুব জানি। আপনি এসেছেন একটি মেয়ের খোঁজ পেতে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। ভিনিসিয়াস ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, লিজিয়া—আমার লিজিয়া, আমি এসেছি আমার লিজিয়ার সন্ধান পাবার জন্যে। তুমি দিতে পারবে লিজিয়ার কোন সন্ধান?

—পারবো।

—তাহলে বলো লিজিয়া কোথায় আছে।

—কোথায় আছে, তা ঠিক বলতে পারবো না, তবে আমার ধারণা কোন বিশেষ একটা ধর্মের লোকজন তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

—কোন ধর্মের লোকজন ? ভিনিসিয়াস অবাক হয়ে বললেন।

—তা আমি কি করে জানবো। সে তো আপনারই জানার কথা। লিজিয়ার মেশামেশি কাদের সাথে তা আপনি জানেন না ?

—আমি কিছু জানি না।

—আচ্ছা মনে করে দেখুন তো, লিজিয়াকে আপনি কোনদিন কোন বিশেষ কাজ করতে দেখেছিলেন কি না।

—কাজ ? কি বিশেষ কাজ ? ভিনিসিয়াস অবাক কণ্ঠে বললেন।

—এই—মানে কোন ছবিটবি আঁকার ব্যাপার—

—ছবি ? হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি লিজিয়াকে একদিন ছবি আঁকতে দেখেছিলাম বটে—

—কিসের ছবি ? চিলোন ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

—মাছের। ভিনিসিয়াস বললেন, একদিন তাকে আমি মাছের ছবি আঁকতে দেখেছি।

—বুঝতে পেরেছি। চিলোন সোৎসাহে বলল, লিজিয়া খ্রীষ্টান। যীশুখ্রীষ্টের উপাসক। খ্রীষ্টধর্মের প্রতীক চিহ্ন হল মাছ।

—ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ভিনিসিয়াস বললেন, যীশুখ্রীষ্টের কথা শুনেছি। তাকে তো ক্রুশে ঝুলিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

—মেরে ফেললে কি হবে। যীশুখ্রীষ্টের ভক্ত হয়েছে অনেক। আমাদের এই রোমেই অনেক গরীব মানুষ গোপনে যীশুর ভজনা করে—যীশুকে তারা ত্রাণকর্তা ভাবে।

—নীরো তো এদের দেখতে পারেন না।

—হ্যাঁ, নীরোর ভয়ে এরা লুকিয়ে থাকে—মাছের ছবি এঁকে নিজেদের পরিচয় দেয়।

—এত জিনিস থাকতে মাছের ছবি কেন ?

—'যীশুখ্রীষ্ট, তুমিই ত্রাণকর্তা'—এই বাক্যে যে কটি শব্দ আছে, গ্রীক ভাষায় তার প্রতিটির প্রথম অক্ষর পর পর সাজিয়ে গেলে 'ইকথাস' শব্দটি পাওয়া যায়—এর মানে হল 'মাছ'। এই জন্যই 'মাছ' খ্রীষ্টধর্মের প্রতীক চিহ্ন হয়ে পড়েছে।

—তুমি তো অনেক কিছু জানো চিলোন, ভিনিসিয়াস বললেন, এখন বলো তো লিজিয়া কোথায় আছে ?

—আমার বিশ্বাস, লিজিয়া আছে ওই খ্রীষ্টানদের ডেরায়।

—তুমি চেনো সেই ডেরা ?

—চিনি না। তবে খুঁজে বের করতে পারবো।

—বেশ। তবে যে করেই হোক খুঁজে বের করো।

—খুঁজে বের করতে হলে টাকা-পয়সার দরকার।

—টাকার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। ভিনিসিয়াস টাকার তোড়া তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এই নাও। লিজিয়াকে খুঁজে বের করতে পারলে আরো অনেক টাকা দেবো।

ভিনিসিয়াস এবার যাবার জন্যে উঠলেন।

চিলোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু মনে রেখো, লিজিয়াকে অবশ্যই খুঁজে বের করা চাইই। সন্ধ্যের মধ্যেই তুমি আমাকে খবর দেবে।

চিলোন ঘাড় নেড়ে বলল, দেবো।

চিলোন সারাদিন ধরে খোঁজ খবর নিয়ে সন্ধ্যের সময় ভিনিসিয়াসের সাথে দেখা করল।

—পেয়েছি, খোঁজ পেয়েছি।

—কোথায় ? কোথায় লিজিয়া ?

—না, লিজিয়ার খোঁজ পাইনি, তবে এমন জায়গার খোঁজ পেয়েছি যেখানে গেলে লিজিয়ার দেখা পাওয়া যেতে পারে।

—ব্যাপারটা কি খুলে বলো। ভিনিসিয়াস অধৈর্য কণ্ঠে বললেন।

—কাল সন্ধ্যের সময় রোমের বাইরে নোমেন্তান গেটের ওধারে পাহাড়ের গুহায় খ্রীষ্টানদের এক জমায়েত হবে। শুনলাম যে কে এক পিটার সেখানে আসবে। তাই রাজ্যের সব খ্রীষ্টান সেখানে হাজির হবে। লিজিয়াও সেখানে যাবে নিশ্চয়। সেখানে গেলেই তার দেখা পাবেন।

—তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে।

—ওরে বাবা। আমি যেতে পারবো না। খ্রীষ্টানরা এমনিতে শুনেছি ভালো। কিন্তু আমার মতো একজন লোককে দেখলে—না মশাই তা আমি যেতে পারবো না—আপনি একলাই যান।

—তোমার কোন ভয় নেই। আমি ক্রোটনকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

—ক্রোটন? মানে সেই পালোয়ান?

—হ্যাঁ—ওই তো এখন রোমের সেরা পালোয়ান। ও একাই একশো লোকের মহড়া নিতে পারে।

—একশো লোকের মহড়া নিতে পারলে কি হবে? ওখানে শুনেছি হাজার হাজার খ্রীষ্টান আসবে।

ভিনিসিয়াস বুঝতে পারলেন চিলোন লোকটা মহা ধূর্ত। শুধু কথায় কাজ হবে না। তিনি আর একটা টাকার তোড়া বের করে বললেন, এটা রাখো। কাজ হাসিল হলে আরো পাবে।

চিলোন ছোঁ মেরে টাকার তোড়াটা নিয়ে বলল, আরো তো পাবো বলছেন, কিন্তু পাবার আগেই যদি খতম হয়ে যাই, তবে আর পেয়ে লাভ কি বলুন।

ভিনিসিয়াস বললেন, না, তুমি খতম হবে না। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তুমি শুধু সাথে থাকবে। যা করবার আমি আর ক্রোটন করবো।

চিলোন বলল, যা করবার খুব সাবধানে করবেন মশাই। খ্রীষ্টানরা কিন্তু হাজারে হাজারে জমায়েত হবে মনে রাখবেন। খুব সাবধান—

—আরে না না—তোমার কোন ভয় নেই।

—ভয় নেই আবার ভরসাও পাচ্ছি না। তা টাকা যখন নিয়েছি, তখন সঙ্গে যেতেই হবে।

—তোমার কোন ভয় নেই। ভিনিসিয়াস অভয় দিয়ে বললেন, আমরা ছদ্মবেশে যাবো। কেউ আমাদের চিনতে পারবে না। আমরা এমন সাজ পোশাক করে যাবো যে মনে হবে আমরাও সেই পল না কে—তার ধর্মকথা শুনবার জন্যেই যাচ্ছি।

—দেখুন শেষ রক্ষা হলে হয়।

—শেষ রক্ষা হবে। কাল সন্ধ্যের পর আমরা সব যাত্রা করবো। তুমি যাবার জন্য তৈরী হয়ে এসো।

চিলোন ভিনিসিয়াসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ডেরার দিকে চলে গেল।

॥ সেন্ট পিটারের বাণী ॥

পরদিন সন্ধ্যের সময় ভিনিসিয়াস ক্রোটন আর চিলোনকে নিয়ে লিজিয়ার সন্ধানে যাত্রা করলেন।

রোম নগরীর বাইরে নোমেন্তান গেট। ছোট ছোট পাহাড় খাদ আর গুহা। রোম নগরীর নাগরিকরা এদিকটায় বিশেষ আসে না।

চিলোন পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছে। পিছনে ভিনিসিয়াস আর ক্রোটন। ওদের সকলের বেশভূষা গাঁয়ের মানুষদের মতো। পরনে লম্বা ঝুলের জামা, মাথায় ইয়া বড় টুপি কান ও মুখের খানিকটা ঢেকে ফেলেছে। হাতে চোরা লণ্ঠন। আর কোমরে ছোরা।

বালির খাদ পেরিয়ে কিছুদূর যাবার পর ওরা দেখতে পেল—তাদের মতো আরো মানুষ সারি সারি চলেছে। অনেকের হাতে তাদের মতো চোরা লণ্ঠন।

চিলোন ফিসফিস করে বলল, এরা সব খ্রীষ্টান পিটারের ধর্মকথা শুনতে যাচ্ছে।

—তাহলে তো এদের মধ্যেই লিজিয়া থাকতে পারে।

—থাকতে পারে। কিন্তু চিনে বের করবেন কি করে।

ভিনিসিয়াস জবাব না দিয়ে মৃদু হাসলেন। লিজিয়ার ছায়ামূর্তি দেখলেও তিনি ঠিক চিনতে পারবেন।

দলে দলে ভাগ হয়ে খ্রীষ্টানরা চলেছে। দলে ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ী যুবক-যুবতী বাচ্চা-কাচ্চা সবাই আছে।

ভিনিসিয়াস অবাক হয়ে ভাবেন: এরা সবাই কিসের টানে এত কষ্ট করে চলেছে? পিটারের ধর্মকথা? ধর্মকথা শুনে কি লাভ হবে ওদের? সেই যীশুকে কবে মেরে ফেলা হয়েছে। তবু তার এত ভক্ত! কি শান্তি পেয়েছে এরা ভক্ত হয়ে?

মেয়েদের দল দেখলেই ভিনিসিয়াস তাড়াতাড়ি পা ফেলে কাছে চলে যান। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন। তারপর হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। নাঃ। লিজিয়া এদের মধ্যে নেই।

ভিনিসিয়াস বারবার খ্রীষ্টানদের দলের মধ্যে লিজিয়াকে খুঁজতে যান, আর বারবারই হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। তবে কি লিজিয়াকে এদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না? হতাশায় ভিনিসিয়াসের মন ভেঙে পড়ে।

এদিকে পথও আর শেষ হয় না।

হাঁটছেন তো হাঁটছেনই।

চিলোনকে জিজ্ঞাসা করেন, কতদূর?

চিলোন বলে, আর সামান্যই। এই তো এসে গেছি।

আরো অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতে হল।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে।

হঠাৎ চিলোন ভিনিসিয়াসের হাতে চাপ দিল, এসে গেছি।

ভিনিসিয়াস চারধারে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। চারধারে পাহাড়ের দেয়াল। মাঝখানে বিশাল একটা সমতলভূমি। পাহাড়ের

খাঁজে খাঁজে অসংখ্য আলোর বিন্দু। বোঝা যায় ওখানে হাজার হাজার মানুষ বসে আছে।

সমতল জায়গাটার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পাথর। বেদীর মতো করে সাজানো। পাথরের চারধারে অনেকখানি জায়গা ঘেরা। সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে আছে অনেক মানুষ। মাঝখানের বড় পাথরের ঠিক সামনে একটি দীর্ঘ ক্রশ। একজন দীর্ঘদেহী লম্বা দাড়িওয়ালা সৌম্য চেহারার মানুষ ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন।

চিলোন দাড়িওয়ালা লোকটাকে দেখিয়ে বলল, ওই হল পল। উনিই খ্রীষ্টানদের দীক্ষা দেন।

—আরে। ওকে তো আমি প্লতিয়াসের বাড়িতে দেখেছি। ভিনিসিয়াস বললেন, লিজিয়ার মায়ের সাথে লোকটা অনেকক্ষণ ধরে কি সব কথা বলত।

—আপনি কোনদিন কথা বলেছেন ওর সাথে?

—আমি? ঘৃণায় মুখ বেঁকে গেল ভিনিসিয়াসের, ওই রকম চাষাভুষোর মতো দেখতে লোকের সাথে কথা বলবো আমি!

—চাষাভুষোর মতো দেখতে হলেও এই লোকটি নাকি খ্রীষ্টানদের গুরু। ওকে সেন্ট পল বলে সবাই।

—পলের পিছনে এই ছেলেটি কে? হাতে জলের পাত্র।

—ওর নাম নাজারিয়াস। ওই জলের পাত্র থেকে সবার মাথায় ও জল ছিটিয়ে দেয়। ওই দেখুন, পল দীক্ষা দিতে শুরু করেছেন।

ভিনিসিয়াস বললেন, চল আমরা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই যেখান থেকে সব কিছু লক্ষ্য করা যাবে। আর বেরোনোর সময় সকলকে ভালো করে দেখা যাবে।

ওরা একটা কোণের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করতে লাগলেন।

সেন্ট পল প্রতিটি নতজানু লোকের কাছে গিয়ে মাথায় হাত দিচ্ছেন। নাজারিয়াসের জলের পাত্র থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে

দিচ্ছেন মাথায় আর বলছেন, পরম পিতা, তাঁর পুত্র আর পবিত্র আত্মা- ঈশ্বরের এই ত্রিমূর্তির নামে আমি তোমায় পবিত্র ধর্মে দীক্ষা দান করছি।

একে একে বহু মানুষের দীক্ষা দেওয়া হল।

পল বললেন, পবিত্র ধর্ম সম্পর্কে তোমাদের মনে যদি কোন দ্বিধা বা সংশয় থেকে থাকে, তবে মন খুলে প্রশ্ন করো, তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন এমন একজন সাধু যিনি নিজের চোখে যীশুকে দেখেছিলেন, নিজের হাতে তাঁর পবিত্র পাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন। ইনি জেরুজালেম থেকে এসেছেন তোমাদের সাথে কথা বলতে। ইনি আগে ছিলেন সামান্য একজন জেলে। যীশুর সান্নিধ্যে আসবার পর এঁর নাম হয়েছে সেন্ট পিটার। ইনি এখন তোমাদের সামনে আসছেন।

এবার সেই বড় পাথরখানার উপর উঠে দাঁড়ালেন সৌম্য চেহারার একজন বয়স্ক পুরুষ। মুখে শিশুর মতো সরল হাসি।

চারধারে গুঞ্জন উঠল: সেন্ট পিটার সেন্ট পিটার। পিটার দু হাতে সকলকে থামতে ইঙ্গিত করে বলতে শুরু করলেন—আমি প্রভু যীশুর সেবক। প্রভুর কণ্ঠস্বর প্রথম শুনি গালিলির সমুদ্রের ধারে। সেদিন সারারাত ধরে পরিশ্রম করে একটা মাছও আমরা ধরতে পারিনি। শ্রান্ত দেহে আমরা নৌকা নিয়ে ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ শুনলাম, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম, সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছেন অপরূপ সুন্দর একজন যুবা পুরুষ। দেবদূতের মতো চেহারা। মুখে স্বর্গীয় হাসি।

এই সুন্দর চেহারার মানুষকে দেখামাত্র আমি ক্ষুধাতৃষ্ণা ক্লান্তি সব ভুলে গেলাম।

আমাদের নৌকা তীরে লাগলে সেই দেবদূতের মতো মানুষটি বললেন, আমি তোমাদের নৌকায় উঠে কথা বলতে চাই।

আমরা তাঁকে সাদরে নৌকায় নিয়ে এলাম। তিনি আমাদের

শোনাতে লাগলেন পরম পিতা ঈশ্বরের কথা—স্বর্গরাজ্যের কথা। শুনতে শুনতে আনন্দে আমাদের মন ভরে উঠল। আমরা বুঝতে পারলাম ইনিই যীশুখ্রীষ্ট, ইনিই আমাদের ত্রাণকর্তা।

যীশু তখন আমাদের বললেন, তোমরা এবার গভীর জলে জাল ফেল।

যীশুর কথা অনুযায়ী আমরা গভীর জলে জাল ফেলে অনেক মাছ পেলাম।

যীশু তখন হেসে বললেন, এই তোমাদের শেষ মাছ ধরা। এবার তোমরা জীবন সমুদ্রে জাল ফেলে মানুষ ধরবে। আমার সঙ্গে চল তোমরা।

বিনা বাক্য ব্যয়ে আমি ও আমার দু ভাই জেমস ও জন তাঁর সাথে চললাম।

প্রভু সব শ্রেণীর মানুষের কাছে গিয়ে ঈশ্বরের কথা বলতে লাগলেন। মানুষকে বললেন ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। একে একে আমরা বারোজন তাঁর শিষ্য হলাম।

আমাদের প্রভু ক্ষুধিতের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের মুখে তুলে দিতেন খাদ্য, তৃষিতের পাশে গিয়ে তাদের মুখে তুলে দিতেন পানীয়, শান্তিহীন মানুষের পাশে গিয়ে শোনাতেন শান্তির বাণী।

আমরা সবাই যেন প্রভুর মধ্যে মিশে গিয়েছিলাম। তাই তাঁর সাথে শেষবারের মতো যখন আহার করতে বসি, তখন মনের আবেগে বলে ফেলেছিলাম, প্রভু, তোমার জন্যে মৃত্যুবরণেও আমার ভয় নেই। প্রভু হেসে বললেন, পিটার, আজ রাতে মোরগ ডাকবার আগে আমার পরিচয় তুমি তিনবার অস্বীকার করবে।

আমি প্রভুর সে কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারলাম কিছুক্ষণ পর।

রাজার লোকেরা আমার প্রভুকে ধরে নিয়ে বিচার করতে বসল। তারা আমাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করল, আমি প্রভুকে চিনি কিনা।

আমি ভয় পেয়ে তিনবার উত্তর দিলাম ঃ ও লোকটিকে আমি চিনি না।

এর পর আমার প্রভুকে ওরা ক্রুশকাঠে ঝুলিয়ে পেরেক দিয়ে হাত পা বিদ্ধ করে দিল। তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল কাঁটার মুকুট।

আমার প্রভুর সারা শরীর দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তবু তাঁর মুখে যন্ত্রণার কোন ছাপ নেই। চোখে তাঁর ক্ষমা সুন্দর স্নিগ্ধতা। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে আমার প্রভু বললেন, পিতা, এরা জানে না এরা কি করছে, এদের তুমি ক্ষমা করো।

আমি আমার প্রভুর কাছে অপরাধ করেছিলাম। প্রভু আমাকে ক্ষমা করলেন। আমার মতো অন্যান্য যারা অপরাধ করেছিল, তাদেরও তিনি ক্ষমা করলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর তাঁকে সমাধিস্থ করে আমরা ঘরে ফিরলাম ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। শূন্য অন্ধকার ঘর।

কিন্তু আশ্চর্য। সেই শূন্য অন্ধকার ঘর হঠাৎ এক উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, আর সেই আলোকে আমরা প্রভুকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

তাঁর ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছে, কিন্তু মুখে সেই স্বর্গীয় কমনীয়তা। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে বললেন, তোমরা শান্তি লাভ করো।

তিনি আমাদের বললেন, তোমরা সারা পৃথিবীতে আমার বাণী প্রচার করো।

তিনি বললেন ঃ বিনম্ররা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। অনুতপ্তরা পাবে সান্ত্বনা। ক্ষুধিত তৃষিতদের আমি খাদ্য দ্বারা তৃপ্ত করবো। দয়ালুরা ঈশ্বরের কৃপালাভের অধিকারী। অন্তরে যারা পবিত্র তারা ঈশ্বরকে দর্শন করবে। প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হবে, অন্যের প্রতি

খুব ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। যদি কেউ অভিশাপ দেয়, তাকে করবে আশীর্বাদ।

সেন্ট পিটারের উদাত্ত কণ্ঠস্বর গানের মতো যেন চারধারে ছড়িয়ে পড়ছিল। হাজার হাজার নরনারী মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল তাঁর কথা।

পিটার বলতে লাগলেন, আমাদের প্রভু সত্যধর্মের জন্যে তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করে মৃত্যু বরণ করেছেন। আমাদেরও মৃত্যু বরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার হবে। কিন্তু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। প্রভুর উপর সব সময় আস্থা রাখবে। তিনিই তোমাদের সকলকে ত্রাণ করে স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যাবেন। আমেন।

ভিনিসিয়াস এতক্ষণ তন্ময় হয়ে সেন্ট পিটারের কথা শুনছিলেন।

চিলোনের কথায় যেন তাঁর সম্বিত ফিরল।

চিলোন তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বলল, ভালো করে লক্ষ্য করুন। সকলে এবার বেরিয়ে যাচ্ছে।

ভিনিসিয়াস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

দলে দলে খ্রীষ্টানরা বেরিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ভিনিসিয়াস চমকে উঠলেন।

মেয়েদের একটি দল। সবচেয়ে পিছনে একটি মেয়ে—সারা শরীর আর মুখ কাপড়ে ঢাকা। পিছনে দানবের মতো সেই আর্শাস।

ওই তো লিজিয়া।

ভিনিসিয়াসের চিনতে একটুও ভুল হয়নি।

সত্যি সত্যি লিজিয়া কাপড়ে মুখ ঢেকে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে পথ চলছিল। তার সাথে ছিল সেই বালক নাজারিয়াস, আর তার মা মরিয়াম।

লিজিয়াকে দেখে আনন্দে ভিনিসিয়াসের হৃদয় উদ্বেল। ইচ্ছে হল, চিলের মতো ছোঁ মেরে লিজিয়াকে তুলে নিয়ে চলে যায়।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব। আগে পিছে অনেক লোক। লিজিয়া চীৎকার করলে ভীষণ বিপদ ঘটবে। তার থেকে ওদের পিছু পিছু যাওয়া যাক। রাস্তা একটু নির্জন হলে লিজিয়াকে তুলে আনা যাবে।

ক্রোটন রয়েছে আর্শাসকে মোকাবিলা করবার জন্যে।

ভিনিসিয়াস তাঁর দল নিয়ে ওদের পিছু পিছু যেতে লাগলেন।

লিজিয়ার দলটি হাঁটতে হাঁটতে রোমের মধ্যে ঢুকে গলির পর গলি পেরিয়ে খ্রীষ্টানদের পাড়ায় ঢুকল। অন্যান্য খ্রীষ্টানরা যে যার বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। লিজিয়ার দল একটি বাড়ির সামনে দাঁড়াল। এবার ওরা ভিতরে ঢুকে যাবে।

ভিনিসিয়াস ক্রোটনকে ইসারা করলেন।

ক্রোটন ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর্শাসের উপর।

ব্যস। শুরু হয়ে গেল দুজনের ধস্তাধস্তি। কেউ কম যায় না। ক্রোটন রোমের সেরা পালোয়ান। গায়ে অসুরের শক্তি। অন্য দিকে আর্শাস নিজে একটা দানব।

একে অন্যকে খতম করবার জন্যে মরীয়া হয়ে যুঝতে লাগল। লিজিয়া ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে।

ভিনিসিয়াসও সেই সঙ্গে ভিতরে ঢুকেছেন।

কিন্তু ভিতরে ঢুকে আর লিজিয়াকে খুঁজে পান না। চারধারে শুধু ঘর। কোন ঘরে লিজিয়া ঢুকে পড়েছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

পাগলের মতো তিনি এঘর ওঘর করতে লাগলেন।

তাঁর ধারণা ক্রোটন এতক্ষণে আর্শাসকে খতম করে ফেলেছে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হয়েছে উলটো।

আর্শাসের সঙ্গে ধস্তাধ্বস্তি করতে করতে ক্রোটনের অবস্থা কাহিল। আর্শাসের চাপে তার দম বেরিয়ে যাচ্ছে। হাত পা ছড়িয়ে মাটির

উপর গড়িয়ে পড়তেই আর্শাস তার দেহটাকে তুলে নিয়ে বলের মতো ছুড়ে দিল আকাশের পানে।

শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে ক্রোটনের বিশাল দেহটা মাটিতে আছড়ে পড়ল। হাড়গোড় গেল গুঁড়ো হয়ে। আর্শাস এত রেগে ছিল যে সে সেই হাড়গোড় ভাঙা দেহটা নিয়ে আবার ছুঁড়ে দিল। এবার সেটা গিয়ে পড়ল নদীর জলে!

এবার আর্শাস বাড়ির মধ্যে ঢুকে কিছু দূর যেতেই সামনে পেল ভিনিসিয়াসকে।

ভিনিসিয়াস তাকে দেখেই কোমর থেকে ছোরা খুলে নিয়ে তার দিকে তাক করে ছুঁড়তে গেলেন।

কিন্তু তার আগেই আর্শাস তার বিশাল লম্বা হাত দিয়ে ভিনিসিয়াসের হাত ধরে মুচড়ে দিল।

ভিনিসিয়াসের হাত থেকে ছোরা খসে পড়ল। তিনি অন্য হাত দিয়ে আর্শাসের গলা চেপে ধরলেন।

আর্শাস এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ভিনিসিয়াসকে ধাক্কা মারল।

সেই ধাক্কায় ভিনিসিয়াস উলটে পড়ে গেলেন। একটা ব্রোঞ্জের মূর্তির সঙ্গে তাঁর মাথা ঠুকে গেল ভীষণ জোরে। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল মাথা দিয়ে।

তিনি চেতনা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে জ্ঞান হল ভিনিসিয়াসের।

জ্ঞান হতে তিনি চোখ মেললেন। চোখ মেলেই তিনি শিয়রের কাছে দেখলেন একখানি অপরূপ সুন্দর মুখ। সে মুখে স্নিগ্ধ করুণা আর ভালোবাসা আঁকা। ভিনিসিয়াস মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সব ব্যথা বেদনা ভুলে গেলেন।

তিনি মাথা আর একটু তুলতে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় কাতর শব্দ করে উঠলেন।

লিজিয়া সঙ্গে সঙ্গে জলে স্পঞ্জ ভিজিয়ে সাবধানে ভিনিসিয়াসের মাথার ক্ষতস্থানে বোলাতে লাগল।

বড় আরাম পেলেন ভিনিসিয়াস। আরামে চোখ বুজে এল তাঁর।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার চোখ মেললেন। এবার আর ঘরের মধ্যে কাউকে দেখতে পেলেন না।

ব্যথাও বেশ কম কম লাগছে। ভিনিসিয়াস এবার উঠে দাঁড়ালেন। জানালার ধারে চেয়ারের উপর তাঁর পোশাকটি রাখা আছে। তিনি জানালার ধারে গেলেন পোষাকটি আনবার জন্যে।

জানালার বাইরে লিজিয়াকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে মনটা আবার খুশিতে ভরে উঠল!

আর সেই সময় আর্শাস এসে লিজিয়াকে কি যেন বলল।

আর্শাসকে দেখে ভিনিসিয়াসের মনটা বিরূপ হয়ে গেল।

লিজিয়া ভিনিসিয়াসকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এল।

—তুমি উঠে দাঁড়িয়েছ?

—হ্যাঁ, আমি এখন সুস্থ। তোমার সেবার জন্য ধন্যবাদ।

লিজিয়া বড় বড় চোখ মেলে তাকাল।

—আর্শাস তোমার সাথে কথা বলতে চায়।

—আর্শাসের আবার কি কথা?

—ও নিজেই তোমাকে বলবে। ডাকবো?

—বেশ তো ডাকো।

লিজিয়া আর্শাসের নাম ধরে ডাকতে আর্শাস সেখানে হাজির হল।

— কি বলবে বলো।

—আপনার বন্ধুকে আমি হত্যা করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

—হত্যা করেছো বেশ করেছো, এতে ক্ষমা চাইবার কি আছে?

—আমাদের ধর্মে হত্যা করা পাপ! আর্শাস বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

—তোমাদের আবার ধর্ম। ভিনিসিয়াস ব্যঙ্গের সুরে বললেন, ওই যীশুখ্রীষ্ট না কে সে আবার তোমাদের ধর্মগুরু।

—ও কথা বলো না। লিজিয়া বিষন্ন স্বরে বলল, যীশু আমাদের সবার পরিত্রাতা। তিনি অপরাধীকে অপরাধ স্বীকার করতে শিখিয়েছেন। আর্শাস নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। তুমি ওকে ক্ষমা করো।

—আর্শাস আমাকে হত্যা করুক না কেন। ভিনিসিয়াস উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তাহলে ও আমার ক্ষমা পাবে। কালই তো ও সুযোগ পেয়েছিল আমাকে মেরে ফেলবার। মারল না কেন? আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম, তুমি আমাকে সেবা করে বাঁচিয়ে তুললে। তোমার এই ব্যবহারের অর্থ আমি বুঝতে পারি না।

—বুঝতে পারলে ভালো হতো। লিজিয়া মৃদু কণ্ঠে বলল।

—আমি বুঝতে চাই না। তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু আজ তোমাকে মুক্তি দিলাম। আমি তোমার কাছে চির বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি।

ভিনিসিয়াস চলে যেতে উদ্যত হলেন।

লিজিয়া এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

—তুমি যেও না। আমি তোমাকে ভীষণ ঘৃণা করি। দু হাতে মুখ ঢেকে লিজিয়া বলল, তবু তোমায় ভালোবাসি।

ভিনিসিয়াস অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

লিজিয়ার অপরূপ সুন্দর চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। যেন গোলাপের উপর বৃষ্টিধারা!

আর্শাসের দিকে তাকিয়ে ভিনিসিয়াস কোমল কণ্ঠে বললেন, তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম আর্শাস। তুমি যেতে পারো।

আর্শাস চলে গেল।

ভিনিসিয়াস লিজিয়ার কাছে এসে স্নিগ্ধস্বরে বললেন, লিজিয়া, এবার তুমিও আমাকে ক্ষমা করো! আমি তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি। তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমি তার মর্যাদা রাখবো। আমি তোমাকে বিবাহ করে সম্মানে ঘরে তুলবো।

—সত্যিই তুমি আমাকে বিবাহ করবে? লিজিয়া কান্নাভেজা গলায় বলল।

—খাঁটি রোমান কখনো মিথ্যা বলে না লিজিয়া।

—তাহলে সেন্ট পল মন্ত্র পড়ে আমাদের বিবাহ দেবেন।

—মন্ত্র পড়ে আবার বিবাহ হয় নাকি? রোমানদের মধ্যে তো এমন বিবাহ হয় না।

—খ্রীষ্টানদের মধ্যে হয়, লিজিয়া বলল, বিবাহের সময় সেন্ট পল আমাদের দিয়ে যীশুর প্রার্থনা বাণী বলবেন। যীশু আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

—কোথায় তোমাদের যীশু? তিনি তো মৃত।

—না। তিনি মৃত নন। লিজিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলল, যীশু চির অমর। ওই ছাখো তাঁকে। লিজিয়া দেওয়ালে ঝোলানো কাঠের ক্রুশের দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল।

—ওটা তো কাঠের সেই ক্রুশ। ওর উপরেই শুনেছি যীশুকে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

—হ্যাঁ, ওই মারণ যন্ত্রই এখন আমাদের কাছে নূতন জীবনের পবিত্র প্রতীক হয়ে পড়েছে। আমাদের কাছে যীশুখ্রীষ্ট আর ওই ক্রুশ এক হয়ে গেছে।

ভিনিসিয়াস মুগ্ধ চোখে লিজিয়ার বিশ্বাস ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনের মধ্যেও যেন এক গভীর আলোড়ন শুরু হল। লিজিয়া কোথা থেকে পেল মনের এই বিশ্বাস? এই বিশ্বাসে এত শান্তি!

ভিনিসিয়াস বললেন, লিজিয়া তুমি যদি বলো, আমিও তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করতে পারি।

—আমার কথায় তুমি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করবে কেন? অন্তরে বিশ্বাস এলে তবেই তুমি এ ধর্ম গ্রহণ করো।

ভিনিসিয়াস বললেন, বিশ্বাস টিশ্বাস তো পরের কথা। বিবাহের পর আমি আমাদের বাড়ির বাগানে একটা বিরাট কাঠের ক্রশ তৈরী করাবো। আমার বাগানে তো অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছে, যীশুর না হয় আর একটা বাড়বে।

—না না। তুমি ও ভাবে যীশুর মূর্তি রেখো না। লিজিয়া কাতর কণ্ঠে বলল, অন্য দেবদেবীর সঙ্গে হেলা ফেলা করে যীশুকে তুমি রেখো না। তাহলে আমি কষ্ট পাবো। যীশু আমার প্রাণ। আমার বুকের মধ্যে তাঁর আসন।

—তার মানে? ভিনিসিয়াস চটে গিয়ে বললেন, যীশুকে তুমি আমার চেয়ে ভালোবাসো? না-না—খবরদার, আমি ছাড়া আর কাউকে তুমি ভালোবাসতে পারবে না। সে আমি সহ্য করবো না।

লিজিয়া ব্যথা ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল ভিনিসিয়াসের দিকে। তার কাছ থেকে সে এই ব্যবহার আশা করেনি। ভিনিসিয়াসকে সে গভীরভাবে ভালোবাসে। কিন্তু যীশু যে সবার উপরে।

এই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন সেন্ট পল। সৌম্য চেহারা। মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

ভিনিসিয়াসকে দেখে বললেন, তোমার জন্যে খুব চিন্তায় ছিলাম। তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছো দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করছি।

লিজিয়া পলের কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে বলে, ফাদার, মার্কাস ভিনিসিয়াস আমাকে বিবাহ করতে চান।

—এ তো খুব আনন্দের কথা। পল স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, এ বিবাহে তোমরা সুখী হবে।

—কিন্তু ফাদার, যীশুকে উনি ভালোবাসতে দেবেন না। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

সেণ্ট পল স্নিগ্ধ হেসে বললেন, মার্কাস ভিনিসিয়াস, তুমি তো রোমান রাজ্যের বড় একজন সেনাপতি। অনেক রাজ্য তুমি জয় করেছো। কিন্তু কতজন মানুষকে তুমি জয় করেছো?

—রাজ্য জয়টাই তো আসল কথা।

—না আসল কথা নয়। মানুষকে জয় করাই হল আসল কথা। ঘৃণা, রক্তপাত, শত্রুতা এসব দিয়ে মানুষকে জয় করা যায় না। একমাত্র ভালোবাসা দিয়েই মানুষকে জয় করা যায়। আমাদের প্রভু যীশু ভালোবাসা দিয়েই সকল শ্রেণীর মানুষকে জয় করেছিলেন। তাই আমরা সকলে হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভালোবাসি।

ভিনিসিয়াস অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, আপনারা যীশুকে ভালোবাসুন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু লিজিয়া রোমান সেনাপতি মার্কাস ভিনিসিয়াসের স্ত্রী হতে চলেছে। সে ওই যীশু টিশুকে ভালোবাসতে পারবে না।

লিজিয়ার অন্তর ব্যথায় ভরে গেল।

সে আর্তকণ্ঠে বলল, এ সব তুমি কি বলছো মার্কাস। প্রভু যীশু আছেন আমার সকল অন্তর জুড়ে। তাঁর প্রতি ভক্তি ভালোবাসা আমার কত গভীর তা তোমায় বোঝাতে পারবো না। কিন্তু তোমাকেও আমি ভালোবাসি মার্কাস—খুব ভালোবাসি।

ভিনিসিয়াস গম্ভীর গলায় বললেন, না এক সাথে তুমি দুজনকে ভালোবাসতে পারবে না। ওই যীশু কিংবা আমি—এদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে।

লিজিয়া মার্কাসের কথার কি উত্তর দেবে। সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পল ভিনিসিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললেন, মার্কাস ভিনিসিয়াস, দেবতাকে ভালোবাসা আর মানুষকে ভালোবাসা দুটো আলাদা

ব্যাপার। এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তুমি লিজিয়াকে এ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করতে চেও না। যীশু বলেছেন—

ভিনিসিয়াস চিৎকার করে বললেন, থামো তুমি। যীশু কি বলেছেন তা আমি শুনতে চাই না।

তারপর লিজিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, লিজিয়া, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে চলো।

—না, এ অবস্থায় আমি তোমার সাথে যেতে পারি না।

—কি বললে? রাগে ভিনিসিয়াসের মুখ আগুনের মতো লাল হয়ে গেল। কঠিন দৃষ্টিতে তিনি লিজিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লিজিয়ার চোখ কাঠের ক্রশের দিকে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

ভিনিসিয়াস পাগলের মতো ছুটে গেলেন সেই কাঠের ক্রশের দিকে। এক টানে ক্রশটি দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে সেটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

—এ তুমি কি করলে। লিজিয়া কেঁদে উঠে লুটিয়ে পড়ল সেই ভাঙা টুকরোগুলোর উপর। বুক দিয়ে সেগুলি আগলে রাখল।

ভিনিসিয়াস ঝড়ের বেগে ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

॥ রোম আগুনে জ্বলছে ॥

সমুদ্রের তীরে এ্যান্টিয়ামে সম্রাট নীরোর সুন্দর প্রাসাদ। সম্রাট নীরো সেখানে সাময়িকভাবে বাস করছেন। সেখান থেকেই তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করছেন।

নীরো সঙ্গে নিয়েছেন অন্তরঙ্গ কয়েকজন সহচরকে। এর মধ্যে আছেন পেট্রোনিয়াস।

প্রাসাদের সামনে খোলা জায়গায় তিনটি বিশাল শিবির তৈরী

করা হয়েছে। এক-একটা শিবির যেন এক একটা ক্ষুদে নগর। আরাম বিলাসের সব রকম আয়োজন মজুত। অসংখ্য দাসদাসী দিনরাত কাজ করে চলেছে।

মাঝের শিবিরটা সবচেয়ে বড়ো। এটা সম্রাট নীরোর জন্যে নির্দিষ্ট। অন্য দুটো সম্রাজ্ঞী পপ্পিয়া আর পেত্রোনিয়াসের জন্যে নির্দিষ্ট।

সম্রাট নীরো অসম্ভব খেয়ালী। যখন যে খেয়াল ধরেন, তাই নিয়েই দিনরাত মশগুল।

এখন সম্রাটের খেয়াল হয়েছে নূতন এক আদর্শ নগরী নির্মাণের। পুরোনো রোম তাঁর পছন্দ নয়। তিনি এমন এক নূতন রোম নগরী নির্মাণ করতে চান যা সৌন্দর্যে সুষমায় হবে বিশ্বের সেরা নগরী। প্রতিটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে সুন্দর মনোরম পরিকল্পনায়। প্রাসাদের চারধারে থাকবে সরোবর। সরোবরের স্বচ্ছ জলে সাঁতার কাটবে হাঁসের দল।

নগরীর রাজপথ হবে দুধের মতো সাদা। পথের ধারে ধারে ফুলের গাছ।

নীরো আদর্শ নগরী তৈরীর স্বপ্ন দেখছেন। আর তাঁকে একাজে সাহায্য করছেন রাজস্থপতি ফেরন।

শিবিরের মধ্যে বসে নীরো আর ফেরন নূতন নগরী নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেখানে পেত্রোনিয়াস ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার নেই।

নীরোর সামনে আদর্শ নগরীর নমুনা। ফেরন তাঁকে খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

যে জায়গাটা নীরোর পছন্দ হচ্ছে না, সেখানে আবার নূতন করে সংশোধন করা হচ্ছে।

ফেরন রাজস্থপতি হলেও তোষামোদে ওস্তাদ। তিনি নীরোর

প্রশংসা করে বলেন, ধন্য মহানুভব সম্রাট। আপনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পী এবং সেইসঙ্গে অসামান্য স্থপতিও। আপনার প্রতিভা সর্বতোমুখী।

নীরো এর উত্তরে মৃদু হাসলেন।

ফেরন বললেন, আপনার পরামর্শে আজ যে নূতন নগরীর নমুনা নির্মাণ করা হয়েছে তা সকলকে দেখাতে ইচ্ছা করে।

নীরো এবার বললেন, একথাটা তুমি ভালো বলেছো ফেরন, আমার এ আদর্শ নগরীর নমুনা সকলে দেখুক। আমি পেত্রোনিয়াসকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

নীরোর ডাক পেয়ে পেত্রোনিয়াস সেখানে উপস্থিত হলেন।

নীরো বললে, ছাখো তো পেত্রোনিয়াস, আমি যে নূতন রোম গড়তে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে তার নমুনা।

—ভালোই তো হয়েছে। পেত্রোনিয়াস বললেন, কিন্তু এ নূতন রোম নির্মাণ করা হবে কোথায়?

—কেন? পুরোনো রোমের জায়গায়।

—তাহলে তো আমাদের গর্ব আর গৌরব প্রাচীন রোম ধ্বংস করা দরকার। পুরোনো রোম যতদিন থাকবে, ততদিন তো নূতন নির্মাণ করা যাবে না।

—পুরোনো রোম এখনো আছে নাকি? নীরো বিস্মিত কণ্ঠে বললেন।

—থাকবে না কেন? পুরোনো রোম সমগ্র রোমান জাতির গৌরব। চিরদিন আমাদের সে গৌরবের রোম থাকবে।

—তাই নাকি? নীরোর কণ্ঠে বিদ্রূপ, দেখি তাইজেলিনাসকে জিজ্ঞাসা করা যাক। সেই সঠিক উত্তর দিতে পারবে। এই কে আছিস। তাইজেলিনাসকে একবার ডাক তো।

তাইজেলিনাস সেখানে হাজির হয়ে নীরোকে অভিবাদন করলেন।

নীরো বললেন, তাইজেলিনাস, পুরোনো রোম কি এখনও আছে ?

তাইজেলিনাস বললেন, কিছুটা হয়তো আছে, তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। রোম এখন আগুনের নগরী।

—রোম আগুনের নগরী ! সে কি। পেত্রোনিয়াস উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, রোমে আগুন লাগল কখন ?

—আগুন লাগেনি, লাগানো হয়েছে, নীরো থেমে থেমে বললেন, মনে আছে একদিন তুমি আমার একটি কবিতায় আগুনের বর্ণনার প্রশংসা করনি। বলেছিলে বর্ণনা তেমন জীবন্ত হয়নি। হোমার ট্রয়ের আগুন দেখেছিলেন বলেই বর্ণনাকে অমন জীবন্ত করতে পেরেছিলেন। আমিও তাই আমার বর্ণনাকে জীবন্ত করার জন্যেই রোমে আগুন দেবার নির্দেশ দিয়েছি।

—সম্রাট ! পেত্রোনিয়াস আর্তকণ্ঠে বললেন, রোমের অসংখ্য মানুষের কি হবে ?

—মরবে। নীরো নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, প্রাণভয়ে এদিক ওদিক পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে করতে তারা কিভাবে পতঙ্গের মতো আগুনে পুড়ে মরে আমি বসে বসে তাই দেখবো আর কবিতা লিখবো। এবার আগুনের বর্ণনা আমি জীবন্ত করে তুলবো।

—রোমে যে আমার প্রাসাদ আছে।

—তোমার প্রাসাদের কোন ক্ষতি হবে না। তাইজেলিনাস বললেন, অভিজাত রাজপুরুষদের প্রাসাদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু গরীব সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

সেই সময় সেখানে উপস্থিত হলেন মার্কাস ভিনিসিয়াস।

লিজিয়ার বাড়ি থেকে আসবার পর তার অবস্থা হয়েছিল পাগলের মতো। পেত্রোনিয়াস তাকে সঙ্গে করে এনেছিলেন শিবিরে।

ভিনিসিয়াস ততক্ষণে শুনে ফেলেছেন রোমে আগুন লাগানোর

কথা। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে ভেসে উঠেছে লিজিয়ার মুখ। আগুনে যদি লিজিয়া পুড়ে মরে যায়? উঃ। লিজিয়ার মৃত্যু ভাবা যায় না। লিজিয়ার মৃত্যু হলে তিনি বাঁচবেন কি করে।

নীরোর দরবারে হুকুম ছাড়া ঢোকা যায় না।

তবু ভিনিসিয়াস ছুটে নীরোর দরবারে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, রোমে আগুন লাগানো হয়েছে তা কি সত্যি?

নীরো ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, কে এই বেয়াদপ?

পেত্রোনিয়াস বললেন, এ হল মার্কাস ভিনিসিয়াস, আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি।

—ও। তাই বুঝি। তোমার বেয়াদপি ক্ষমা করলাম মার্কাস ভিনিসিয়াস। হ্যাঁ শোন, রোম আগুনে জ্বলছে একথা সত্যি, আর আমারই আদেশে সে আগুন লাগানো হয়েছে।

ভিনিসিয়াস একথা শুনে অস্থির হয়ে উঠলেন। আর একমুহূর্ত দেরী না করে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

সম্রাটের সামনে থেকে এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়া ভয়ানক অপরাধ। ভিনিসিয়াসকে এভাবে চলে যেতে দেখে দুজন সেনাপতি তার পিছু পিছু ধাওয়া করল।

ভিনিসিয়াস বাইরে বেরিয়ে এসে সামনে যে রথখানা পেলেন, তাতে উঠে বসলেন। রথখানা ছুটতে লাগল।

তাঁর পিছনে দুজন সেনাপতি দুখানা রথ নিয়ে তাঁকে তাড়া করল।

ভিনিসিয়াস কোমর থেকে একখানা ছোরা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল একখানা রথের উপর। অব্যর্থ লক্ষ্যে সেই ছোরা এসে বিঁধে গেল একজন সেনাপতির ঘাড়ে। সেনাপতি লুটিয়ে পড়ল রথের উপর।

অন্য রথখানা তীব্র গতিতে ছুটে আসতে লাগল ভিনিসিয়াসের দিকে। ভিনিসিয়াসের কাছে আর কোন ছোরা নেই। হাতে শুধু ঘোড়াকে মারবার জন্য চাবুক।

অন্য রথখানা কাছে আসতেই মার্কাস সেই চাবুক শূন্যে কয়েকবার ঘোরালেন।

আর কি কৌশলে যেই চাবুকের আগার দিকটা ফাঁসের মতো আটকে গেল সেই সেনাপতির গলায়। এবার ভিনিসিয়াস চাবুক ধরে এমনভাবে টান দিলেন যে সেই সেনাপতি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। রথের চাকা চলে গেল তার শরীরের উপর দিয়ে।

মার্কাসের রথ বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলল রোমের পানে।

দূর থেকে দেখা গেল রোমের আকাশ আগুনে লাল হয়ে গেছে।

ভিনিসিয়াস পাগলের মতো রথ ছোটাতে লাগলেন।

ক্রমে রোমের সীমানা এসে পড়ল। দলে দলে মানুষ পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। কাতারে কাতারে অসংখ্য শিশু বালক যুবক যুবতী বুড়ো বুড়ী। চারদিক ধোঁয়ায় ভরে গেছে।

রাজপথ জনসমুদ্র। এত মানুষের মধ্যে রথ চালানো অসম্ভব।

ভিনিসিয়াস লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন রথ থেকে। তারপর ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ছুটতে লাগলেন রোমের প্রাচীর লক্ষ্য করে।

ভালো করে তাকানো যায় না। দম বন্ধ হয়ে আসে। তবু ভিনিসিয়াস অন্ধের মতো হাঁটতে লাগলেন। লিজিয়ার বাড়ি তাঁকে খুঁজে পেতেই হবে।

অবশেষে অনেক কষ্টে খুঁজে পেলেন সে বাড়ি। দাউ দাউ করে জ্বলছে সে বাড়ির জানালা দরজা। সামনের দিকে ভেঙে পড়েছে দেওয়ালের এক অংশ।

ভিনিসিয়াস চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, লিজিয়া লিজিয়া।

তাঁর সেই ডাকে কেউ সাড়া দিল না।

ভিনিসিয়াস এ ঘর থেকে সে ঘর লিজিয়াকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

—লিজিয়া - লিজিয়া - কোথায় তুমি!

কারো কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

ভিনিসিয়াস বুঝতে পারলেন এ বাড়িতে কেউ নেই। আগুন ধরে গেলে সকলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

ভিনিসিয়াসের সারা গায়ে ফোসকা পড়ে গেছে। চোখ মুখ আগুনের তাপে ঝলসে গেছে।

তবু তাঁর মনে এ জন্যে কোন বেদনা বোধ নেই।

তার মনে শুধু এক চিন্তা, লিজিয়া কোথায়।

চারদিকে সেই আগুনের লেলিহান শিখা।

ভিনিসিয়াস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তার মাঝে। হঠাৎ সামনের জানালাটা ভেঙে পড়তেই তার যেন চেতনা ফিরে এল।

তিনি এক লাফে সেই আগুনের কুণ্ড পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

পথে সেই একই দৃশ্য।

অসংখ্য নর-নারী পাগলের মতো ছুটছে। ছুটতে ছুটতে অনেকে মুখ থুবড়ে পড়ছে। তাদের শরীরের উপর দিয়ে ছুটছে হাজার হাজার নরনারী।

ভিনিসিয়াসও তাদের সঙ্গে ছুটতে লাগলেন।

এক জায়গায় দেখলেন বহু নরনারী পথের উপর বসে পড়েছে। তাদের আর ছোটার শক্তি নেই। শিশু আর মেয়ের দল চিৎকার করে কাঁদছে। বয়স্করা দেবদেবীর কাছে দয়া ভিক্ষা করছে।

ভিনিসিয়াস এদের পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় থমকে দাঁড়ালেন। কি ভয়ংকর অবস্থা। এতগুলো মানুষ নীরবে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে। আর কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যু এসে এদের গ্রাস করবে।

ভিনিসিয়াস রোমান সেনাপতি। যুদ্ধে অসংখ্য মানুষকে তিনি মরতে দেখেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে এদের দেখে তাঁর মনটা হাহাকারে ভরে গেল।

তিনি যেন সেই মুহূর্তে তার নিজের সমস্যার কথা ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন লিজিয়ার কথা। তিনি ভাবলেন, আহা, এদের কোন ভাবে বাঁচানো যায় না? কোন ভাবে যায় না এদের রক্ষা করা?

কিন্তু কিভাবে রক্ষা করা যায় ? কি ভাবে ? কি ভাবে ? হঠাৎ তার মনে পড়ল সেদিন সেই পাহাড়ের মধ্যে সেন্ট পিটারের মুখে শোনা যীশুখ্রীষ্টের বাণী। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—

ভিনিসিয়াস এসব কথা ভাবছেন, আর ঠিক সেই সময় পায়ের ঠিক নিচে শুনলেন কেমন একটা জলপ্রবাহের শব্দ। নীচ দিয়ে জলধারা বয়ে চলেছে। ভিনিসিয়াস বুঝতে পারলেন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটি বড় নর্দমার ঝাঁজরির কাছে। এই মুখ দিয়ে নীচে নেমে যায় রোমের ধাঙড়রা। এই সব নর্দমাগুলো শেষ হয়েছে নদীতে।

এইসব হতভাগ্য মানুষগুলোকে কোনমতে এই নর্দমার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে নদীর দিকে নিয়ে যেতে পারলে এরা হয়তো বেঁচে যাবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। ভিনিসিয়াস দু হাত দিয়ে নর্দমার ঝাঁঝরিটা তুলে ফেললেন। তারপর সেই মুমূর্ষু মৃত্যু প্রতীক্ষারত মানুষগুলোকে ডাক দিয়ে বললেন, তোমরা সব আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবো।

পথের উপর বসে থাকা সেই মানুষগুলো একটু নড়ে চড়ে বসল যেন।

ভিনিসিয়াস তাদের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবো।

এবার সেই হতভাগ্য মানুষগুলো উঠে দাঁড়াল। ভিনিসিয়াস তাদের হাত ধরে একে একে সেই নর্দমার মধ্যে নামিয়ে দিলেন। শেষ মানুষটি নেমে যাবার পর তিনি নিজে একটি জ্বলন্ত কাঠ হাতে করে নামলেন।

তারপর তিনি সেই জ্বলন্ত কাঠ হাতে নিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে লাগলেন। তার পিছনে অসংখ্য মানুষ।

অনেকক্ষণ হেঁটে শেষে নদীর কাছে এসে পৌঁছোলেন। নদীতে জল কম। সেই জলের মধ্যে দিয়ে মার্কাস সকলকে নদীর ওপারে রেখে এলেন।

নদীর এপারে অগণিত মানুষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ রোম ছেড়ে পালাচ্ছে। এতগুলো লোককে নিরাপদে পার করতে পেরে তার মনে এক অদ্ভুত আনন্দ। নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে গেছেন।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, দৈত্যের মতো একটা মানুষ ধীরে ধীরে পথ চলছে। তার পাশে একটি দল। আর সেই দলের মধ্যে—

ভিনিসিয়াসের হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল। লিজিয়া লিজিয়া।

ভিনিসিয়াস ছুটে গেলেন সেই দলটার দিকে।

লিজিয়াও ভিনিসিয়াসকে দেখতে পেয়েছিল।

—মার্কাস মার্কাস।

লিজিয়া ছুটতে লাগল তার দিকে।

হয়তো পড়েই যেত পথে।

ভিনিসিয়াস তাকে ধরে ফেললেন।

লিজিয়া তার বুকে মুখ রে'খ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বালক নাজারিয়াস ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

—তোমার কি হয়েছে? ভিনিসিয়াস কোমল গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমার মা আগুনে পুড়ে মারা গেছে।

নাজারিয়াস কাঁদতে কাঁদতে বলল।

ভিনিসিয়াস তাকে দুহাতে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর লিজিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ থেকে আমাদের পথ এক।

॥ নীরোর নারকীয় ঘোষণা ॥

সারা রোম দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলছে। রাত্রিবেলায় অন্ধকারের মধ্যে সে আগুনের লেলিহান শিখা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।

বাড়িঘরগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। অসংখ্য মানুষের ঝলসানো শরীর শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে পড়ছে আগুনের অরণ্যে।

সম্রাট নীরো তার পারিষদবর্গ নিয়ে প্রাসাদের ছাদে নিরাপদ দূরত্বে বসে সেই আগুনের দৃশ্য দেখছেন। আগুনের বিধ্বংসী লীলা দেখার জন্যে তার জন্যে ছাদের উপর নির্মাণ করা হয়েছে বিশাল এক মঞ্চ। মঞ্চের উপর সম্রাজ্ঞী পপ্পিয়া আর বাছা বাছা কয়েকজন অন্তরঙ্গ পারিষদ নিয়ে তিনি বসে আছেন।

সারা রোম আগুনে জ্বলছে। দূর থেকে আগুনের রূপ দেখতে দেখতে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছেন। আহা। এমন মনোরম দৃশ্য কে কবে দেখেছে। আগুনের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখবেন জগতের সেরা কাব্য।

নীরো থেকে থেকে বলে উঠছেন, আহা। কি অপরূপ। কি স্বর্গীয় দৃশ্য।

তিনি আর আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না। বাঁশী নিয়ে বাজাতে শুরু করলেন।

এদিকে রোমের মানুষ ততক্ষণে জেনে গিয়েছে, নীরোর আদেশে রোমে আগুন দেওয়া হয়েছে। তারা দলে দলে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসতে লাগল সেই মঞ্চের দিকে। তাদের ক্রুদ্ধ সম্মিলিত কণ্ঠ সমুদ্র গর্জনের মতো শোনাতে লাগল।

—নীরোকে হত্যা কর। নীরোকে হত্যা কর।

পারিষদবৃন্দের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কিন্তু নিরো বাঁশী বাজানোয় তন্ময়। কেউ তার তন্ময়তা ভাঙাতে সাহস করল না।

হাজার হাজার ক্রুদ্ধ মানুষের দল ততক্ষণে মঞ্চের খুব কাছে এসে পৌঁছেছে।

—মাতৃঘাতী নীরো নিপাত যাক। নরঘাতক নীরো নিপাত যাক।

এবার নীরোর কানে সে ক্রুদ্ধ ধ্বনি প্রবেশ করল। বাঁশী থামিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? এত গোলমাল কেন?

—রোমের মানুষ আমাদের আক্রমণ করতে ছুটে আসছে।

—আমাদের আক্রমণ করতে চায় কেন ওরা?

—আপনি ওদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছেন. পেত্রোনিয়াস বললেন, তাই ওরাও আপনাকে এবং সেই সঙ্গে আমাকেও মৃত্যু মুখে ঠেলে দিতে চাইছে।

—ওদের স্পর্ধা তো কম নয়। তাইজেলিনাস, আমার রক্ষীদের বল ওদের হটিয়ে দিতে।

তাইজেলিনাস চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন রক্তাক্ত দেহে। রোমের মানুষ পাথর ছুঁড়ে তার সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে।

—মহামান্য সম্রাট, শীঘ্র নাগরিকদের নিরস্ত করুন। না হলে ওরা প্রাসাদ আক্রমণ করে সকলকে হত্যা করবে।

—আমার রক্ষীদল কোথায়?

—জনতার সমুদ্রে তারা ডুবে গেছে। তাইজেলিনাস বললেন, শীঘ্র যাহা উপায় করুন। আর সময় নেই।

—আমি কি উপায় করব? নীরো বললেন, তুমি যে ভাবে হোক ওদের ঠেকাও।

—আমার সে ক্ষমতা নেই। তাইজেলিনাস অসহায় কণ্ঠে বললেন।

—বালির বাঁধ ভেঙে পড়লে বন্যাকে রোখার ক্ষমতা কারো নেই। পেত্রোনিয়াস বললেন।

—আছে। সম্রাজ্ঞী পপ্পিয়া হাসলেন। সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এই মুহূর্তে ঘোষণা করে দাও ওই নোংরা খ্রীষ্টানরা রোমে আগুন দিয়েছে। রোমের নাগরিকরা খ্রীষ্টানদের দেখতে পারেন না। তারা একথা বিশ্বাস করবে।

—এ আপনি বলছেন কি মহামান্য সম্রাজ্ঞী। পেত্রোনিয়াস বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, এর ফলে যে নির্দোষ খ্রীষ্টানরা সব মারা পড়বে।

—পেত্রোনিয়াস তুমি থামো। নীরো বললেন, সম্রাজ্ঞী পপ্পিয়া যথার্থ পরামর্শই দিয়েছেন। রোমের সব খ্রীষ্টান মারা পড়লে কিছু যায় আসে না। এই মুহূর্তে আমি রাজকীয় ঘোষণা করে দিচ্ছি: রোমের

এই আগুনের জন্য খ্রীষ্টানরা দায়ী। তাদের কারাগারে বন্দী করা হবে। তারপর এক শুভদিনে তাদের ফেলে দেওয়া হবে ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুর সামনে। রোমের মহান নাগরিকদের জন্য এই অপরূপ দৃশ্য দেখাবার ব্যবস্থা করা হবে।

ক্রুদ্ধ জনতার সামনে সঙ্গে সঙ্গে নীরোর এ রাজকীয় ঘোষণা প্রচার করে তাদের শান্ত করা হল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল রাজার সেনাবাহিনীর তৎপরতা। তারা দলে দলে নেমে পড়ল খ্রীষ্টানদের ধরবার জন্যে। খ্রীষ্টানদের ধরে ধরে তারা কারাগারে বন্দী করে রাখল।

রোমের নাগরিকরা খ্রীষ্টানদের প্রতি বিরূপ। তাই খ্রীষ্টানদের ধরা খুব অসুবিধা হলো না।

ভিনিসিয়াস লিজিয়া, আর্শাস এবং আরো অনেককে প্লতিয়াসের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

সৈনিকরা সেখান থেকে তাদের ধরে এনে কারাগারে ঢুকিয়ে দিল।

ভিনিসিয়াস ছিলেন পেত্রোনিয়াসের বাড়িতে। তিনি এ খবর পেয়ে রাগে ক্ষোভে ছুটে গেলেন কারাগারের সামনে।

তাইজেলিনাস ভিনিসিয়াসের শত্রু। তিনি জানতেন ভিনিসিয়াস খ্রীষ্টানদের বন্ধু। তাঁর আদেশে রক্ষীদল ভিনিসিয়াসকে কারাগারে বন্দী করে রাখল।

রোমের কারাগারে এখন অসংখ্য খ্রীষ্টান। কারাগারের মধ্যে তারা একসঙ্গে থাকে। তাদের মনে কোন ভয় নেই, কোন দুঃখ নেই। যীশু-খ্রীষ্টের শেখানো প্রার্থনার মধ্যে তারা খুঁজে পেয়েছে এক আশ্চর্য শক্তি।

ভিনিসিয়াস তাদের ছাখেন আর অবাক হয়ে ভাবেন, খ্রীষ্টধর্মে এরা পেয়েছে কি আশ্চর্য শান্তি। এরা মৃত্যুভয় পর্যন্ত জয় করেছে।

ভিনিসিয়াসের মনে কোন দুঃখ নেই। কারাগারে তিনি পেয়েছেন লিজিয়ার সান্নিধ্য। কারাগার তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে স্বর্গলোক।

তাঁর মধ্যে এসেছে গভীর এক পরিবর্তন। লিজিয়াকে তিনি সারা

অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন। কিন্তু তাঁর এ ভালোবাসার মধ্যে কোন কামনা নেই। খ্রীষ্টধর্মের মহিমা তিনি বুঝতে পেরেছেন। খ্রীষ্টধর্ম শান্তির আশ্রয়। এ ধর্মে আছে প্রেম করুণা ক্ষমা আর নির্ভীকতা।

ভিনিসিয়াস আর নীরোকে ভয় করেন না। নীরোর অত্যাচার সহ্য করবার ক্ষমতা রাখেন। মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত। মৃত্যুর আগে তিনি লিজিয়াকে বিবাহ করবেন: এই তাঁর শেষ চেষ্টা। কিন্তু বিবাহ দেবে কে?

লিজিয়ার ইচ্ছা, স্বয়ং সেন্ট পিটার তাদের বিবাহের প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করবেন।

কিন্তু সেন্ট পিটার কোথায়?

রোমের প্রতিটি খ্রীষ্টানকে ধরে এনে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেন্ট পিটারকে ধরা সম্ভব হয়নি। তিনি কোথায়?

॥ সেন্ট পিটারের মৃত্যু ॥

সেন্ট পিটার জেরুজালেম থেকে রোমে এসেছিলেন রোমবাসীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে।

সম্রাট নীরোর আদেশে সেনাদল সব খ্রীষ্টানদের ধরে কারাগারে পুরলো। অথচ পিটারকে কেউ স্পর্শ করল না। এ যেন এক অলৌকিক ব্যাপার।

পিটারের চোখের সামনে থেকে হাজার হাজার খ্রীষ্টানকে ধরা হল। অথচ তাঁকে কেউ ধরল না।

রোমে আর একজনও খ্রীষ্টান নেই। পিটার ভাবলেন, এখন আর তাঁর এখানে থাকা অর্থহীন। এখানে থাকলে কোনদিন সেনাদল তাঁকে ধরে কারাগারে ঢোকাবে।

তার চেয়ে এখান থেকে সরে পড়াই ভালো।

এখান থেকে চলে যেতে পারলে তিনি পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষদের কাছে খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করতে পারবেন। রোমের খ্রীষ্টানরা নীরোর অত্যাচারে তো এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। এখানে থেকে কোন লাভ নেই।

এই ভেবে পিটার শেষ রাতে রোম ত্যাগ করে হাঁটতে লাগলেন।

আকাশের বুকে তারাগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। হঠাৎ পূর্ব আকাশে উজ্জ্বল আলোক জ্যোতি। সেই জ্যোতি ধীরে ধীরে আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল পিটারের সামনে।

পিটার বিস্ময়ে আনন্দে সেই অলৌকিক জ্যোতির পানে তাকিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটির উপর। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন, ক্যুয়ো ভাদিস ডোমিনি? হে প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

সেই উজ্জ্বল জ্যোতির মধ্যে থেকে শোনা গেল করুণাস্নিগ্ধ কণ্ঠ, আমি যাচ্ছি রোমে। কারাগারে আমার পুত্ররা বন্দী। আমি যাচ্ছি তাদের কাছে।

পিটার আর্তকণ্ঠে বললেন, হে প্রভু, আমার অন্যায় হয়েছে। আমি তাদের ফেলে এসে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পালাচ্ছি।

সেই আলোক জ্যোতির গতি রোমের দিকে।

পিটার আকুল কণ্ঠে বললেন, ক্যুয়ো ভাদিস ডোমিনি? হে প্রভু আপনি কোথায় চলেছেন?

—আমি চলেছি রোমে। আমার অত্যাচারিত পুত্রদের জন্য আমি আবার ক্রুশে ঝুলবো।

পিটারের মন থেকে এক মুহূর্তে দ্বিধা ভয় দূর হয়ে গেল। তিনি ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালেন রোমের রাজপথে।

রাজপথে দাঁড়িয়ে তিনি প্রচার করতে লাগলেন, হে রোমের প্রিয় নাগরিকবৃন্দ, আমি তোমাদের জন্যে নিয়ে এসেছি যীশুখ্রীষ্টের অমৃতবাণী। এ বাণী তোমাদের দেবে নবজীবন, তোমাদের দেবে অমৃতের আস্বাদন, তোমাদের দেবে সত্য পথের সন্ধান।

রাজপথে ভিড় হয়ে গেল। নাগরিকরা প্রথমে কৌতূহলী হয়ে পিটারের কথা শুনতে এল। পরে যীশুর বাণীর মহিমায় মুগ্ধ হয়ে পিটারের কাছে দীক্ষা নিতে লাগল।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে কারাগারে মরতে হবে, একথা জেনেও তারা ভয় পেল না।

রোমের মানুষের মধ্যে নূতন চেতনা এনে দিলেন পিটার।

কিন্তু বেশীদিন চলল না। নীরোর সেনাদল একদিন তাঁকে ধরে নিয়ে কারাগারে বন্দী করে রাখল।

সেন্ট পিটারকে দেখে কারাগারে বন্দী খ্রীষ্টানদের মধ্যে যেন আনন্দের বান ডাকল।

লিজিয়া ভিনিসিয়াসের হাত ধরে পিটারের সামনে এসে বলল, আমরা আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আপনি আমাদের বিবাহ দিন।

ভিনিসিয়াস বললেন, তার আগে আপনি আমাকে সত্যধর্মে দীক্ষা দিন।

পিটার ভিনিসিয়াসকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিলেন। তারপর লিজিয়ার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। কারাগারে উৎসবের আনন্দ। মৃত্যুর মধ্যে জীবনের উল্লাস।

পরদিন রক্ষীদল এসে পিটারকে বাইরে বের করে নিয়ে গেল।

আটিকাস পাহাড়ের উপর একটা ক্রুশে তাঁর দেহটাকে লোহার পেরেক বিঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখল। রক্তাক্ত দেহে পিটার খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করতে লাগলেন।

রোমের নাগরিকরা অবাক হয়ে শুনতে লাগল সেই মহিমার বাণী।

ক্রুশবিদ্ধ সেন্ট পিটার নিজের জীবনের বিনিময়ে তাদের দিয়ে গেলেন নূতন জীবন।

॥ পেত্রোনিয়াসের শেষ ভোজসভা ॥

পেত্রোনিয়াসের মনে আজ খুব শান্তি। এতদিন তাঁর মন ছিল

অশান্ত। নীরোকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। আর সেই নীরোর সঙ্গে তাঁকে থাকতে হত বলে তাঁর অন্তর সব সময় জ্বলে পুড়ে যেত। মনে হত, তিনি বিবেকের কাছে ভীষণ অপরাধী হয়ে থাকছেন। নীরোর সব রকম অন্যায়ের তিনিও যেন সঙ্গী।

রোমের অগ্নিকাণ্ড আর নির্দোষ খ্রীষ্টানদের কারাগারে বন্দী করার ঘটনায় তিনি শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন: নীরোর সান্নিধ্যে আর তিনি থাকবেন না।

তবে যাবার আগে তিনি নীরোকে একবার শেষ আঘাত হেনে যাবেন। এতদিন তিনি আরাম বিলাস অর্থের লোভে তার অনেক স্তাবকতা করেছেন। তাকে সেরা কবি গায়ক শিল্পী প্রতিভাবান হিসাবে আখ্যাত করেছেন।

কিন্তু আর নয়। এবার তিনি তার সত্যকার রূপ উন্মোচন করে দেবেন।

পেত্রোনিয়াস তাঁর প্রাসাদে ভোজের আসরে রোমের গণ্যমান্য মানুষদের আমন্ত্রণ জানালেন।

পেত্রোনিয়াসের অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল আর রোমের সম্মানিত বিশিষ্ট অতিথিরা সেই ভোজসভায় উপস্থিত হলেন। পেত্রোনিয়াস সকলকে হাসিমুখে আপ্যায়ন করে বসালেন।

পেত্রোনিয়াসের ভোজসভায় নানা ধরনের অদ্ভুত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলের সামনে সুস্বাদু খাদ্যের পাহাড়। সুন্দরী ক্রীতদাসীরা হাসিমুখে সুরা পরিবেশন করছে।

অতিথিরা সুরা পান করতে করতে গল্পে মেতে উঠেছেন। কেউ জানেন না, হঠাৎ পেত্রোনিয়াস এ ভোজসভার আয়োজন করেছেন কেন।

পেত্রোনিয়াস অবশ্য বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে ভালোবাসেন। কিন্তু রোমের এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ এত বড় ভোজসভার আয়োজন কেমন যেন অস্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকে

বলেই ফেললেন, হঠাৎ আপনার এই আয়োজনের তাৎপর্য তো বুঝে উঠতে পারছি না বন্ধু।

—বুঝবেন। একটু পরেই বুঝবেন। পেত্রোনিয়াস মৃদু হেসে বললেন, বলতে পারেন এ আমার শেষ ভোজের আসর।

—সে কি! সেনেকা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, সম্রাটের সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য চলছে জানি। এ রকম তো আগেও হয়েছে। পরে আবার মিলও হয়ে গেছে।

—এবার আর হবে না। সম্রাটের সঙ্গে ভাব করার আর আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

—আপনি আর সম্রাটের দরবারে যাবেন না?

—না। পেত্রোনিয়াস দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, সম্রাটের দরবারে যাবার প্রয়োজন আমার শেষ হয়ে গেছে। এই দেখুন সম্রাটের উদ্দেশে আমি একটি শেষ পত্র রচনা করেছি। আমি এটি আপনাদের পড়ে শোনাবো।

—শোনান।

পেত্রোনিয়াস তখন জোরে জোরে পড়তে লাগলেন তাঁর পত্র—

হে মহামান্য সম্রাট নীরো, আমি আর আপনার দরবারে যাবো না। আমি চলে যাবো নিজের জায়গায়। তবে যাবার আগে বলে যাই: আপনি সমগ্র বিশ্বের চোখে জঘন্যতম অপরাধী। আপনি ভূতপূর্ব সম্রাটকে হত্যা করেছেন। হত্যা করেছেন নিজের মা আগ্রিপিনাকে, হত্যা করেছেন নিজের স্ত্রী অকটেভিয়াকে। হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে আপনি আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন। আপনি পৃথিবীর জঘন্যতম ঘাতক।

আপনি নিজেকে সেরা কবি গায়ক হিসাবে দাবী করেন। কিন্তু জেনে রাখুন, কবিত্বের ছিটেফোঁটাও নেই আপনার মধ্যে। কবিতার নামে আপনি কতকগুলো ছাইভস্ম লেখেন। আর আপনার গান? গাধাও আপনার চেয়ে ভালো গাইতে পারে। আপনার

বিদঘুটে কবিতা আর ওই বেসুরো গান শুনে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। আর না। আর আমি আপনার ওসব পাগলামো সহ্য করবো না। আমার শেষ অনুরোধ, আপনি আর কবিতা লিখে বা গান শুনিয়ে কাউকে বিরক্ত করবেন না।

পেত্রোনিয়াস এবার থামলেন।

অতিথিরা এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাঁর পত্র পড়া শুনছিলেন। সর্বনাশ। পেত্রোনিয়াস এ করছেন কি। এ পত্র নীরোর হাতে পড়ার একটাই পরিণতি ঃ মৃত্যু। এ যে পেত্রোনিয়াস সাধ করে মৃত্যুকে ডেকে আনছেন। সেনেকা বললেন, বন্ধু, আপনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করছেন।

—তা জানি। পেত্রোনিয়াস হাসিমুখে বললেন, তবে এ মৃত্যু নীরোর ইচ্ছায় হবে না। হবে আমার ইচ্ছায়। আপনি শুধু এই পত্রখানি নীরোর হাতে পৌঁছে দেবেন দয়া করে।

এই বলে পেত্রোনিয়াস তাঁর বাঁ হাত বাড়িয়ে ধরলেন। একজন অচেনা গ্রীক এসে একটা ছোরা দিয়ে তাঁর বাঁ হাতের শিরা অনেকখানি কেটে দিল। গল গল করে রক্ত বেরোতে লাগল। পেত্রোনিয়াসের চোখ মুখ ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়লেন। পরম শান্তিতে তাঁর চোখ বুঁজে এল।

পেত্রোনিয়াসের এই আত্মবিসর্জনে অতিথিরা শোকে বিমূঢ়। যে ভোজসভা কিছুক্ষণ আগে ছিল আনন্দ সভা, তাই এখন শোকসভা।

পেত্রোনিয়াসের মৃত্যুতে সকলেই শোকার্ত।

সেনেকা পেত্রোনিয়াসের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে তাঁর পত্রখানি নিয়ে গেলেন নীরোর কাছে। সম্রাটকে অভিবাদন করে বললেন, গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি মার্কাস পেত্রোনিয়াস মৃত্যুবরণ করেছেন।

নীরো বললেন, মৃত্যু বরণ করার আগে আমার অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল তার। আমাকে সে গভীরভাবে ভালোবাসতো। আমার কবিতা গান তার দারুণ প্রিয় ছিল।

—মাননীয় সম্রাট, পেত্রোনিয়াস আপনার জন্যে একটি শেষ পত্র দিয়ে গিয়েছেন।

—দেখি পত্রখানা।

পত্রখানি পড়তে পড়তে নীরোর চোখ লাল হয়ে উঠল। থর থর করে কাঁপতে লাগল সারা শরীর। ক্ষিপ্ত বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো চিৎকার করে বললেন, পেত্রোনিয়াসের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দাও। তার আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে হত্যা করো। আমার কবিতা গানকে অবহেলা করার সাহস। উঃ। পাগলের মতো লাফাতে লাগলেন নীরো।

নীরোর ওই ক্ষিপ্তমূর্তি দেখে সেনেকা নীরবে বিদায় নিলেন।

॥ নীরোর মৃত্যু ॥

সারা রোম নগরে কয়েকদিন ধরে সম্রাটের তরফ থেকে প্রচার করা হয়েছে—

রোমের মহান নাগরিকদের জন্যে অপূর্ব রাজকীয় অনুষ্ঠান: হিংস্র পশুর সঙ্গে মানুষের লড়াই! গ্লাডিয়েটরের লড়াই! স্থান অ্যামফি থিয়েটার।

আগ্রহ উত্তেজনায় রোমবাসীদের ঘুম নেই। তারা জ্যান্ত বাঘ সিংহ ভালুক ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের মরণপণ লড়াই দেখার সুযোগ পাবে।

নীরো খ্রীষ্টানদের ধরে ধরে কারাগারে ভর্তি করে রেখেছে। শোনা যাচ্ছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে ওই সব ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুদের সামনে। বাঁচার জন্যে ওরা লড়াই করবে। আহা! মানুষে পশুতে লড়াই কি চমৎকারই না জমবে।

এর উপর আছে ষাঁড়ের সঙ্গে গ্লাডিয়েটরদের লড়াই। ইয়া তাগড়াই চেহারার স্বাস্থ্যবান গ্লাডিয়েটর ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করবে— বুনো ষাঁড়—সাক্ষাৎ যমদূত।



নীরোর প্রাসাদের কাছে নির্মাণ করা হয়েছে বিশাল অ্যামফি থিয়েটার। হাজার হাজার দর্শকের জন্য তৈরী করা হয়েছে গ্যালারী।

অবশেষে এল সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি। গ্যালারী কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। সম্রাট নীরো দলবল নিয়ে বসেছেন একটি বিশাল মঞ্চে। তার এক পাশে সম্রাজ্ঞী পপ্পিয়া অন্য পাশে অন্তরঙ্গ পারিষদের দল।

সকলের উৎসুখ চোখ বিশাল এ্যারেনার দিকে। এখানেই লড়াই হবে।

অনুষ্ঠান শুরুর ঘন্টা বাজতে এ্যারেনার পাশে একটি ঘরের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল একদল ক্রীতদাস। এরা ছিল সৈনিক! নীরোর আদেশে এদের ক্রীতদাস করে রাখা হয়েছিল।

ক্রীতদাসদের হাতে তরবারি। চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এরা চোখ বাঁধা অবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করবে।

লড়াই শুরু হল। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। আন্দাজে তরবারি চালিয়ে যাচ্ছে। কারো শরীর থেকে মুণ্ড ছিটকে পড়ছে। কারো হাত কেটে পড়ে যাচ্ছে। কারো পেটে তরবারি ঢুকে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে অনেকে রক্তাক্ত দেহে মাটির উপর পড়ে স্থির হয়ে গেল। আর কয়েকজন কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগল।

লাল পোশাক পরা একদল জহ্লাদ এসে সেই আহত লোকগুলোর গলা কুচ কুচ করে কেটে দিল।

একদল লোক এসে মৃতদেহগুলো টেনে নিয়ে গেল। গাড়ি গাড়ি বালি এনে রঙ্গভূমিতে বিছিয়ে দেওয়া হল। এবার নূতন খেলা শুরু হবে।

নূতন খেলার ঘন্টা বাজল। একটা বড় দরজা খুলে গেল। বন্যার স্রোতের মত বেরিয়ে এল খ্রীষ্টান নর-নারী শিশু বুড়ো-বুড়ী।



শত শত খ্রীষ্টান। পেছনে রক্ষীদল। চাবুক মারতে মারতে তাদের বের করে নিয়ে আসছে।

খ্রীষ্টানরা রঙ্গভূমিতে জানু পেতে বসে পড়ল। তারপর গান শুরু করল—যীশুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা গান ছড়িয়ে পড়ল সারা রঙ্গভূমিতে।

ঠিক সেই সময় উল্টো দিকের একটা দরজা খুলে দেওয়া হল। ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এল হিংস্র কুকুরের দল। এসেই খ্রীষ্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে তাদের ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল।

খ্রীষ্টানরা নির্বিকার। তারা সামান্য বাধা দেবার চেষ্টাও করল না, কিংবা মুখ দিয়ে কেউ কাতর শব্দও করল না। সমানে তারা গান গেয়ে যেতে লাগল। হিংস্র কুকুরের দল শেষ খ্রীষ্টানটাকে কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে তাদের হাত-পাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। রক্তাক্ত মুণ্ডগুলো খেল কড়মড় করে চিবিয়ে।

রোমান দর্শকরা এই ব্যাপারে বিশেষ মজা পেল না। তারা চায় লড়াই। খ্রীষ্টানরা যদি প্রাণভয়ে হিংস্র কুকুর দলের সঙ্গে লড়াই করে মরত তাহলে খেলা জমে উঠত। তা না ওরা বিনা লড়াইতে বোকার মতো মরল। এতে মজা কোথায়? সমবেত দর্শকরা এক-যোগে দাবী জানাল: লড়াই লড়াই চাই।

আবার অনুষ্ঠান শুরুর ঘণ্টা বাজল। দরজা খুলে কয়েকশো খ্রীষ্টানকে বের করে আনা হল। তারা এসেই জানু পেতে বসে শুরু করল যীশুর বন্দনা গান।

উল্টো দিকের দরজা খুলে দেওয়া হল। বেরিয়ে এল অনেক-গুলো ভীষণ আকৃতির সিংহ। সিংহগুলো ভীষণ গর্জন করে বসে থাকা খ্রীষ্টানগুলোর উপর লাফিয়ে পড়ে তাদের মাথা কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে লাগল। বীভৎস সে দৃশ্য।

সিংহের মুখের মধ্যে জ্যান্ত মানুষের মুণ্ড। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

রোমান দর্শকরা বেশ তারিয়ে তারিয়ে এ দৃশ্য উপভোগ করল।

কিন্তু এতে কোন মজা পেল না। তারা সমস্বরে দাবী জানাল: লড়াই—লড়াই চাই।

সম্রাট হাত তুলে অভয় দিলেন—হবে—লড়াই হবে। পরদিন মাননীয় দর্শকদের ভয়ংকর লড়াই দেখাবার ব্যবস্থা করা হবে।

পরদিন আবার অনুষ্ঠান শুরু হল।

সম্রাট সম্রাজ্ঞী ও পারিষদবৃন্দ বসে আছেন মঞ্চের উপর।

অনুষ্ঠান শুরুর ঘণ্টা বাজল।

রঙ্গভূমিতে এসে দাঁড়াল আর্শাস। যেন এক বিশাল দৈত্য। রোমান দর্শকরা অবাক হয়ে এই দৈত্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

এ রকম বিশাল দানবীয় শরীর তারা এর আগে দেখেনি। তাদের মনে হল, স্বয়ং হারকিউলিস যেন রঙ্গভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আর্শাস রঙ্গভূমিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে জানে, অন্যান্য খ্রীষ্টানদের মতো তাকেও মরতে হবে। হয় তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মারা হবে, আর না হয় ফেলে দেওয়া হবে সিংহের মুখে। যাই হোক না কেন, সে কোন কিছুতে বাধা দেবে না। অন্যান্য খ্রীষ্টানের মতো যীশুর বন্দনা গান করতে করতে শান্তভাবে মৃত্যু বরণ করবে। এই ভেবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এই সময় খুলে দেওয়া হল অন্য দিকের একটি দরজা। ভয়ানক গর্জন করতে করতে ছুটে এল একটি বিশাল আকৃতির জার্মান ষাঁড়। যেন সাক্ষাৎ যমদূত। ষাঁড়ের শিঙের সঙ্গে বাঁধা অপরূপ সুন্দরী যুবতীর নগ্ন দেহ। এই যুবতী লিজিয়া।

লিজিয়াকে এই অবস্থায় দেখে দর্শকদের গ্যালারী থেকে আকাশ ফাটানো আর্তনাদ করে উঠলেন ভিনিসিয়াস। তাঁকে জোর করে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। নিজের চোখে তাঁকে লিজিয়ার মৃত্যু দেখতে হবে, এই তাঁর শাস্তি। ভিনিসিয়াস রঙ্গভূমিতে আসবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে জোর করে বসিয়ে রাখা হল।

অসহায় ভাবে ভিনিসিয়াস বলতে লাগলেন : যীশু ওকে রক্ষা করবেন। আমি জানি, ঠিক রক্ষা করবেন।

আর্শাস এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এখন ষাঁড়ের শিংএর সঙ্গে বাঁধা লিজিয়াকে দেখে তার শরীরে চাঞ্চল্য জাগল। তার হাত-পায়ের পেশী ফুলে উঠল। মুখ হল ভয়ংকর।

ষাঁড়টা আর্শাসের দিকে তেড়ে আসতেই আর্শাস ক্ষিপ্রগতিতে তার শিং দুটো দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। তার পা ডুবে গেল বালির মধ্যে। শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে গেল।

ষাঁড়টা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আর্শাসকে গুঁতোবার চেষ্টা করছে, ফোঁস ফোঁস করে তার শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে, কিন্তু সেই দৈত্যের হাত থেকে এক চুল ছাড়াতে পারছে না মাথাটাকে।

আর্শাসের বাহুর প্রতিটি পেশী ফুলে উঠেছে। সে এবার ধীরে ধীরে ষাঁড়ের ঘাড়ে চাপ দিচ্ছে।

হাজার হাজার দর্শক স্তব্ধ বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখছে। এমন কি নীরো পর্যন্ত বিস্মিত।

হঠাৎ মট করে শব্দ হল। ষাঁড়ের ঘাড় ভেঙে গেল। লুটিয়ে পড়ল বিশাল জন্তুটা মাটির উপর। আর্শাস সঙ্গে সঙ্গে লিজিয়ার দেহটা নিজের হাতে তুলে নিল।

হাজার হাজার রোমান দর্শক এই দৃশ্য দেখে যেন পাগল হয়ে গেল। তারা বীরের সম্মান দিতে লাগল। আর্শাস আজ তাদের কাছে সবচেয়ে বড় বীর। তারা চীৎকার করে বলতে লাগল : এই বীরকে মুক্তি দিতে হবে। এই বীরকে মুক্তি দিতে হবে।

আর্শাস লিজিয়ার দেহটা হাতের উপর তুলে ধরল। এই করুণ দৃশ্য দেখে দর্শকরা অস্থির হয়ে উঠল। সকলে একযোগে বলতে লাগল : এদের মুক্তি দিতে হবে, এদের মুক্তি দিতে হবে।

চারদিকে বিরাট হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল।

এই সময় মার্কাস ভিনিসিয়াস তাঁর বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে লাফিয়ে

পড়লেন রঙ্গভূমিতে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, মাননীয় রোমান দর্শকবৃন্দ, আমি মার্কাস ভিনিসিয়াস বলছি—তোমাদের সম্রাট নীরো একটা নরপশু। ও নিজের মাকে হত্যা করেছে, নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছে, নিজের খেয়াল খুশির জন্যে সুপ্রাচীন রোম নগর আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। রোম যখন জ্বলছিল, তখন ওই পাপিষ্ঠ মনের আনন্দে বাঁশী বাজাচ্ছিল। ওর অত্যাচারে তোমরা অতিষ্ঠ। তব্ কেন ওর অত্যাচার সহ্য করছো? ওকে টেনে নামাও মঞ্চ থেকে। হত্যা করো ওকে। সমবেত দর্শকরা চোখ মেলে দেখতে লাগল নীরোকে।

দুদিন ধরে রক্ত দেখে দেখে তাদের মনে ধরে গেছে রক্তের নেশা। তাদের নূতন করে মনে পড়ল নীরোর অত্যাচারের কথা। তাই তো! এ তো মহা পাপিষ্ঠ রাজা।

হাজার হাজার দর্শক একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগল :

—হত্যা করো। মহাপাপিষ্ঠকে হত্যা করো।

নীরো হাত তুলে তাদের থামাবার ইঙ্গিত করলেন।

কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না।

হাজার হাজার মানুষ গ্যালারী থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটতে লাগল নীরোর দিকে।

নীরো ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পেছনের দরজা দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

তার আগেই সেখানে চলে এসেছিলেন সম্রাজ্ঞী পপ্পিয়া।

নীরোকে দেখে এগিয়ে এলেন পপ্পিয়া। এভাবে ভয় পেয়ে পালিয়ে আসবার জন্যে তাকে ধিক্কার জানাতে যাচ্ছিলেন।

নীরো পপ্পিয়ার কাছে এসে দু হাত দিয়ে তার গলা টিপে ধরলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল পপ্পিয়ার। মাথাটা কাত হয়ে ঝুলে পড়ল।

পপ্পিয়ার মৃত্যুর পর মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন নীরো। এবার তিনি কি করবেন? কোথায় যাবেন?

সেই সময় সেখানে এসে দাঁড়ালো আন্তি। হাতে তার একটি ছোরা।

আন্তিকে দেখে নীরো বললেন, আমাকে বাঁচাও আন্তি।

আন্তি বললেন, হ্যাঁ আমি তোমাকে বাঁচাতেই এসেছি। এই নাও ছোরা, নিজের বুকে বিঁধিয়ে দাও।

—নিজের বুকে বিঁধিয়ে দেব? নীরো আর্তনাদ করে উঠলেন, আমার মৃত্যু হলে পৃথিবী থেকে যে একজন বিরাট কবি গায়ক চলে যাবে। না-না—আমি মরতে পারবো না।

—মরতে না পারলে ওই হাজার হাজার ক্ষ্যাপা মানুষ এসে তোমায় ধরে নিয়ে কারাগারে পুরে ফেলবে। আর না হয় ক্ষ্যাপা ষাঁড় দিয়ে তোমাকে হত্যা করাবে।

—না-না, ওরকম বীভৎস মৃত্যু আমার চাই না। নীরো আকুল কণ্ঠে বললেন, আমি চাই কবির মৃত্যু শিল্পীর মৃত্যু।

—সেই মৃত্যুই তোমাকে আমি দিচ্ছি। এই নাও ছোরা। দেরী করো না। ওই শোন হাজার হাজার মানুষের নিষ্ঠুর কোলাহল।

নীরো ছোরাখানা হাতে তুলে নিলেন। থর থর করে কাঁপতে লাগল তার হাত। জীবনে কত শত হত্যা তিনি করেছেন। কিন্তু আজ নিজের বুকে ছোরা ঢোকাতে তার হাত থর থর করে কাঁপতে লাগল। ছোরার আগাটা বুকে ঠেকিয়ে তিনি অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

আন্তি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নীরোর সেই ছোরা ধরা হাতে চাপ দিলেন।

ছোরাটা আমূল বিঁধে গেল নীরোর বুকের মধ্যে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল।

সেই রক্তের দিকে তাকিয়ে নীরো শেষ বারের মতো আর্তনাদ করে উঠলেন, হায় হায়। আমার মৃত্যুতে পৃথিবী হারাতে বসেছে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে।

নীরোর দেহ এবার লুটিয়ে পড়ল নীচে। মাটির উপর স্থির হয়ে পড়ে রইল অত্যাচারী খেয়ালী সম্রাট নীরোর মৃতদেহ। আক্তি তার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসলেন। নীরোর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, সারা জীবন ধরে তোমাকে ভালোবেসেছি। মৃত্যুর মধ্যেও সে ভালোবাসা আমার শেষ হবে না।

এই বলে নীরোর বুক থেকে ছোরাটা তুলে নিয়ে আক্তি সেটা নিজের বুকে বিঁধিয়ে দিলেন।

নীরোর পাশেই তার দেহটা গড়িয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

নীরোর শাসনের পর শেষ হল ইতিহাসের অধ্যায়।

মার্কাস খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। লিজিয়াকে স্ত্রীরূপে পেয়ে তিনি সুখী। রোমে আর তিনি থাকতে চান নি। তাই তিনি লিজিয়া আর্শাস আর নাজারিয়াসকে নিয়ে রোম ত্যাগ করে যাত্রা করলেন সিসিলির পথে।

যেতে যেতে তারা উপস্থিত হলেন এ্যালবিয়ন পর্বতের কাছে। পিটার নাজারিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে যখন রোম ত্যাগ করে পালাচ্ছিলেন, তখন এখানেই দেখতে পেয়েছিলেন সেই অলৌকিক স্বর্গীয় আলোক জ্যোতিকে।

পিটার সেই আলোক জ্যোতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ক্যুয়ো ভাদিস ডোমিনি? হে প্রভু, কোথায় চলেছো তুমি?

উত্তর এসেছিল: আমি চলেছি পীড়িত আর্তের কাছে—আমি চলেছি আর একবার ক্রুশ বিদ্ধ হতে।

সেই পবিত্র জায়গায় এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ওরা। ওদের কানে তখন ধ্বনিত হচ্ছে: ক্যুয়ো ভাদিস ডোমিনি? ক্যুয়ো ভাদিস্।

আকাশে বাতাসে মাটিতে মধুর উত্তর ভেসে আসছে: আমি চলেছি পীড়িত আর্তের কাছে—আমি তাদের জন্য বারবার ক্রুশবিদ্ধ হবো।

॥ শেষ ॥